মহর্ষি মনসুর

'মহর্ষি মনসুর' সম্বন্ধে অভিমত

বসুমতী বলেন—"ধর্ম্মবীর মহাত্মা মনসুরের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী—বিষয়টী যেমন সুন্দর, ঘটনাবলী যেরূপ চিত্তাকর্ষক, লেখাও তদনুরূপ প্রাঞ্জল হইয়াছে।"

প্রবাসী বলেন—"সময়ে সময়ে এইরূপ স্বাধীন চিন্তাক্ষম জ্ঞানীর উদ্ভব হইয়া কলের পুতুলের ন্যায় স্থায়ী নিয়মপালন-তৎপর গতানুগতিক জনসমাজকে নিজে ভাবিয়া কাজ করিতে বিশ্বাস অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাঁরা কোন দেশ বা কালে আবদ্ধ নহেন; ইহাঁদের চরিতকথা বিশ্বের সকল সম্প্রদায়েরই অনুশীলন ও অনুধ্যানের বিষয়। লেখক বিশুদ্ধ বাংলায় এই মহর্ষির উপদেশ, ধর্ম্মমত, শিক্ষা প্রভৃতির সহিত তাঁহার জীবনকথা বর্ণন করিয়াছেন; তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভাবিবার শিখিবার অনেক বিষয় পাইবেন।"

এডুকেশন গেজেট বলেন—"পুস্তক খানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ভাষা মার্জ্জিত। আলোচ্য বিষয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর একটী সাধক বৈদান্তিকের জীবনী। এরূপ মহাত্মার পবিত্র চরিত পাঠে সকল জাতীয়েরই উপকার আছে।"

মানসী ও মর্ম্মবাণী বলেন—"মোজাম্মেল হক্ সাহেব উৎকৃষ্ট বাঙ্গালায় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সমালোচ্য পুস্তকখানি সাধারণের নিকট যে আদৃত হইয়াছে, ইহার তৃতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। এই জীবনী-খানিতে পড়িবার, বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক আছে।"

মুসলমান বলেন—"The author has laboured long in the domain of literature, producing things of utility and interest and although in most cases the labours of his brother litterateurs have equally gone without deserving reward, we hope the public will give this (3rd) edition of his book a reassuring encouragement. The author needs no introduction and we conclude by recommending his book to our readers, particularly to those who require to be enlightened with things Islamic and connected with the followers of the Islamic faith".

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত

মহর্ষি মন্সুর

ধর্ম্মবীর মহাত্মা মন্সুর হাল্লাজের অলৌকিক
জীবন-কাহিনী

মোজাম্মেল হক্
প্রণীত

ভূপ্রদক্ষিণ-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার মহাশয়
কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকা-ভূষিত

চতুর্থ সংস্করণ

চৈত্র, ১৩২৫

মূল্য টাকা মাত্র

প্রকাশক—এ. আহ্মদ, বি-এ
"মোস্‌লেম পব্‌লিশিং হাউস্"
৩, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা

প্রিণ্টার :—শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার
সূর্য্য প্রেস
৩৩, গৌরীবেড় লেন, কলিকাতা

উৎসর্গ

১২৮৫ সালের ২৩শে আষাঢ় আমাদের পারিবারিক
এক অতি শোচনীয় স্মরণীয় দিন। সেই দিন
জানি না, কি অশুভ ক্ষণে আমার পরম
শ্রদ্ধাস্পদ প্রতিপালক মাতামহ, আজন্ম
বিশুদ্ধচরিত্র, ন্যায়-নিষ্ঠা-সদাচারের
জলন্ত মূর্ত্তি, সদা স্বধর্ম্ম-
নিরত পুণ্যপুরুষ—

মহাম্মদ বাদ-উল্লা সাহেব

সুস্থ শরীরে সহসা পরলোকগমন করেন।
সেই দিন এবং তাঁহার স্মরণ জন্য, পবিত্র
পুরুষের এই পবিত্র জীবনী-গ্রন্থ তাঁহার
পবিত্র নামে পরম ভক্তি ও
শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থকার
কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত
হইল।

নূতন পুস্তক

কবিবর মোজাম্মেল হক্ প্রণীত

দরাফ খান্ গাজী

(ধর্ম্মমূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শাহ্‌নামা

(২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ)

'মীর-পরিবার'-প্রণেতা

কাজী আব্দুল ওদুদ, বি-এ প্রণীত

নদীবক্ষে

(উপন্যাস)

সুকবি শেখ হবিবর রহমান প্রণীত

আলমগীর

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

নিবেদন

অনেক দিন পূর্ব্বে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু নানারূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ইহা তৎকালে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করি নাই। সম্প্রতি কয়েক জন গুণগ্রাহী বন্ধু ইহার হস্তলিপি দর্শনে মুদ্রাঙ্কনার্থ উপদেশ দেন। তাঁহাদের উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া আজ আমার পূর্ব্ব মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম,— গ্রন্থ প্রচারিত হইল। কিন্তু অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিতে পারে?

ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। এক খানি উর্দ্দু পুস্তিকার মর্ম্মাবলম্বনে অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়া স্বাধীনভাবে রচিত হইয়াছে। সাময়িক রুচির অনুরোধে স্থানে স্থানে নূতন বর্ণনার সংযোগ করা গিয়াছে। বোধ করি, ইহাতে অন্যায় কিছুই হয় নাই। এক্ষণে এতদ্দ্বারা সেই সাধুকুলশিরোমণি মহাত্মা হোসেন মন্‌সুরের পবিত্র নামের পাছে কোন অসম্ভ্রম হয়, ইহাই ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতেছি। আরও, গ্রন্থ মধ্যে কোন কোন স্থলে ধর্ম্মসম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ আছে। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কুত্রাপি কোনরূপ দোষাশ্রয় ঘটিয়া থাকে, তবে দয়াময় জগদীশ্বর যেন এ দীন অজ্ঞানান্ধের সে অপরাধ ক্ষমা করেন, ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। সহৃদয় মুসলমান সমাজও উক্ত ত্রুটি পরিহারার্থ বা ইহার ভ্রম-প্রমাদ পরিবর্জ্জন ও উৎকর্ষ বিধানার্থ বন্ধুভাবে উপদেশ দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিব। এক্ষণে দয়াময়ের কৃপায় ইহার উপর সাধারণের স্নেহদৃষ্টি পড়িলেই আমার পরিশ্রম পুরস্কৃত হইল, বিবেচনা করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইহার রচনাকালে শান্তিপুর জুবিলী মাদ্রাসার পারস্য-শিক্ষক জনাব হাজী মৌলবী মহাম্মদ অবায়েদুল্লা সাহেবের অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

শান্তিপুর—নদীয়া
৯ই আষাঢ়; ১৩০৩

বিনীত
মোজাম্মেল হক্

চতুর্থ সংস্করণের কথা

বাঙ্গালার এই উপন্যাসের যুগে এই মহাপুরুষ-জীবনীর যে দুই বৎসরের মধ্যেই অন্য একটী সংস্করণের প্রয়োজন হইল ইহা আমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা এবং পাঠক-সাধারণের পক্ষে গৌরবের কথা বলিতে হইবে, কেননা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহাপুরুষের কথা, অক্ষম লেখনীপ্রসূত হইলেও, পাঠকগণ তাহা বরণ করিয়া লইতে পশ্চাৎপদ হন না।

বর্ত্তমান সংস্করণে ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব সাধনের জন্য প্রকাশক যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এবারে পুস্তকের আকার বৃদ্ধি, কাগজের মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে ব্যয়বাহুল্য হইলেও পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি হইল না। নিবেদন ইতি

শান্তিপুর
ফাল্গুন; ১৩২৫

বিনীত
গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "প্রায় কোনও মুসলমান লেখকের ভাগ্যাকাশে তাঁহার পুস্তকের সংস্করণ-চন্দ্রমার উদয় হইতে দেখা যায় না।" কথাটী যে সর্ব্বতোভাবে সত্য, তাহা আমার 'মহর্ষি মন্‌সুর' হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। কোথায় ১৩০৩ সাল আর কোথায় ১৩১৫ সালের আরব্ধ কাল; এই দীর্ঘ-কাল পরে—প্রায় যুগাবসানে ইহার পুনঃ সংস্করণ! ইহা কি সংস্করণ বলিয়া মনে হইতে পারে? ফলতঃ এতদ্দ্বারা বঙ্গের মুসলমান সমাজের বিদ্যালোচনার অভাব,—মুসলমানগণের বিদ্যা-শিক্ষায় ঘোর অনাস্থার বিষয়ই বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। হায়! কবে বঙ্গের মুসলমানগণ বিদ্যার সমাদর করিতে শিখি-বেন—কবে তাঁহাদের ঘরে ঘরে পুস্তক-পত্রিকা পঠিত হইবে! বিধাতঃ! সে শুভ দিন কি আসিবে? আসিবে,—আশা হই-তেছে বঙ্গবাসী মুসলমান ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আজ তাহারই ফলে এবং জগৎস্রষ্টার ইচ্ছায় মহর্ষি মন্‌সুরের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, বলিতে হইতেছে। এ সংস্করণে মুদ্রাঙ্কন-কার্য্য যত্নের সহিত সুচারুরূপে সম্পাদিত হই-য়াছে, তদ্ভিন্ন ইহার স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটী সম্পূর্ণ নূতন প্রস্তাব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এক্ষণে প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ সন্তোষলাভ করিলেই আমার শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

শান্তিপুর
জ্যৈষ্ঠ; ১৩১৫

সাধারণের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী
গ্রন্থকার

তৃতীয় সংস্করণের কথা

করুণাময় বিধাতার অনুগ্রহে এই পবিত্র চরিতাখ্যানের আর একটী সংস্করণ হইল। এই সংস্করণে ইহার আদ্যোপান্ত সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং কয়েকটী জটিল ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাতে গ্রন্থ-সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ ছিল না, এবারে সে ত্রুটি পরিহার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সংস্করণের আর একটী বিশেষত্ব এই যে এবার ইহাতে একটী গভীর গবেষণাপূর্ণ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে। ভূমিকাটী সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক, প্রতিভাবান সাহিত্যিক, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত।

সে আজ অনেক দিনের কথা, যখন শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয় ফয়জাবাদে ছিলেন, তখন তিনি 'মহর্ষি মনসুর' পাঠে আমাকে লিখিয়াছিলেন,—"আপনার লেখাতে লালিত্য ও প্রাণ আছে দেখিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। মহাত্মা মনসুর সম্বন্ধে অনেক মুসলমান ভ্রাতাকে প্রশ্ন করিয়া কোন প্রকার সঠিক সংবাদ পাই নাই৷ আপনাব দ্বারা আজ সে অভাব মোচন হইল। আপনি বঙ্গের এক জন প্রকৃত সুসন্তান।" গ্রন্থ সম্বন্ধে ঈদৃশ অনুকূল মত থাকায় আমি মাননীয় পরিব্রাজক মহাশয়কে ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশা পূর্ণ করিয়াছেন; তাঁহার ভূমিকার যোগে এ গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। ফলতঃ ইহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব সাধনার্থ যত্নের ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে সকলে ইহাকে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি

শান্তিপুর
৭ই জ্যৈষ্ঠ; ১৩২৩

সাধারণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী
গ্রন্থকার

সূচিপত্র

ভূমিকা ... ... ১—১২

প্রথম পরিচ্ছেদ—ইরাকে আজ্জম, দৃশ্যশোভা, মনসুরের জন্ম-কথা, বিদ্যাশিক্ষা, খ্যাতিলাভ, মহানগর বোগ্দাদ, তাহার অবস্থান, ঐতিহাসিক তত্ত্ব, দৃশ্যশোভা, মনসুরের গুরু অন্বেষণ, দীক্ষা গ্রহণ ... ... ১৩—২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রতিপত্তিলাভ, দেশভ্রমণ, মক্কাবাস, মাহাত্ম্যোন্মেষ, পারস্য-ভ্রমণ, গ্রন্থপ্রচার, মক্কায় পুনর্গমন, তত্ত্বোপদেশপ্রদান, বোগ্দাদে প্রত্যাগমন, নির্জ্জনবাস, ধর্ম্মোন্মত্ততা, 'আনাল্ হক্' উচ্চারণ, ভীষণ আন্দোলন। ... ২৭—৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ধর্ম্মোন্মত্ততার দ্বিতীয় কারণ, মনসুরের ভগিনীর গুপ্ত সাধনা, মনসুরের তদনুসরণ, ভগিনী যোগমগ্না, দৈবদত্ত অমৃতপান, মনসুরের আত্মপ্রকাশ ও পাত্রাবশিষ্ট পান, ধর্ম্মোন্মত্ততা, ভগিনীর অনুশোচনা ও সান্ত্বনা। ৩৯—৪৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—সাধারণের অনুতাপ ও উপদেশ, মনসুরের উত্তর, তদ্বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, খলিফার নিকট প্রতীকার-প্রার্থনা, কারাবাসাজ্ঞা, বন্দী অদৃশ্য, সাধারণের বিস্ময় ও ভীতি। ৪৯—৬০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—মনসুরের স্বভবনে অবস্থান, মাহাত্ম্য প্রদর্শন, বন্দিগণের কারামুক্তি, কারাধ্যক্ষের চিন্তা, মনসুর ধ্যানরত, তত্ত্বকথা প্রচার। ... ... ৬১—৭৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—মনসুরের স্বপ্নদর্শন, অপূর্ব্ব বস্ত্রাবাস, সাধুসভা, বস্ত্রাবাসে ছিদ্র, ছিদ্র-রোধ-চেষ্টা, হজরতের নিষেধ, স্বপ্ন-ব্যাখ্যা (টীকা)। ... ... ৭৮—৮৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ—মনসুরকে হত্যার ষড়যন্ত্র, শেখ শিব্‌লীর আগমন, শাহ্ জুনেদের সাধারণকে সান্ত্বনা, মন্‌সুরের প্রতি উপদেশ, তাঁহার উত্তর-প্রসঙ্গে নানা তত্ত্বকথা, নিজ মতের দৃঢ়তা, সাধারণের উত্তেজনা, সৈয়দ জুনেদ শাহের নিকট ব্যবস্থা-প্রার্থনা, তাঁহার অমনোযোগিতা, খলিফার নিকট তাহা জ্ঞাপন, ব্যবস্থা দানার্থ খলিফার অনুজ্ঞা, জুনেদ শাহের মৌনা-বলম্বন ও কাতরতা, ব্যবস্থা-প্রাপ্তি। ... ৮৪—১০১

অষ্টম পরিচ্ছেদ—বোগদাদবাসীদের বধ্যভূমি গমন, শেখ শিব্‌-লীর কারাগারে প্রবেশ, মন্‌সুরকে প্রবোধ প্রদান, ধর্ম্মোন্মত্ত-তার পূর্ণ বিকাশ, মনসুরের অবকাশ প্রার্থনা, শেষ আবেদন সাধারণ্যে জ্ঞাপন। ... ... ১০২—১১২

নবম পরিচ্ছেদ—প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এক দিনের জন্য স্থগিত, নগর-বাসীদের উদ্বেগ, শেখ কবিরের আগমন, মন্‌সুরের সহিত কথোপকথন ... ... ১১৩—১২০

দশম পরিচ্ছেদ—মনসুরকে বধ্যভূমিতে আনয়ন, নানা জল্পনা, মন্‌সুরের অদৃশ্য হওন, তাঁহার প্রাপ্তি-মন্ত্রণা, মন্‌সুর-বন্ধুদের নির্য্যাতন, তাঁহার পুনরাবির্ভাব, তৎপ্রতি প্রস্তর বর্ষণ, ফুলা-ঘাতে ক্রন্দন, নানা তত্ত্বকথা, বধ-মঞ্চে আরোহণ, 'আনাল হক্'-উচ্চারণ, জড়-অজড় পদার্থ হইতে 'আনাল্ হক্' শব্দো-খান, বধায়োজন, হস্তকর্ত্তন, রক্তাক্ত অজু, অন্যান্য অঙ্গ-চ্ছেদন, কোরাণের আয়েত উচ্চারণ, মস্তকচ্ছেদন, মাংস-খণ্ড ও রক্তকণিকা হইতে 'আনাল হক্' শব্দোত্থান, সাধা-রণের ভীতি, অগ্নিতে অস্থি-মাংস নিক্ষেপ, অস্থ্যাদি অদগ্ধ হওন, তৎসমুদয় নদীতে নিক্ষেপ। ... ১২১—১৪৫

উপসংহার—জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবন, সাধারণের লাঞ্ছনা, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে মহর্ষির অঙ্গবাস নিক্ষেপ, সমুদ্রের প্রশান্ত-ভাব, চির-শান্তি। ... ... ১৪৬—১৪৮

ভূমিকা

"কহে মনসুর সুন্ কাজি, গায়ের কা পেয়ালা মাৎ পি।
'আনাল হক্' পর্ হো তু সাবিদ্, ওহি কল্‌মা পঢ়াতা যা।"*

আজ অতীব আনন্দের সহিত এই মুখবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই শ্রেণীর এবংবিধ আনন্দ আমি ইতিপূর্ব্বে কখন অনুভব করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কেন যে আমার প্রতি এই ভার অর্পিত হইয়াছে, কিছুই জানি না। যেহেতু আমার দৃঢ় ধারণা যে, আমি কোন প্রকারেই এই মহৎ কার্য্যের উপযুক্ত নহি। যে মহাপুরুষের জীবন-চরিত এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়, তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিবার অধিকার এ রসনায় আছে কি না, সমূহ সন্দেহ। তবে কেন যে এই কাজে হাত দিতে হইল, তাহা বিধাতাই জানেন। সুপণ্ডিত ধর্ম্মপ্রাণ গ্রন্থকর্ত্তা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ইহার ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করায় আমি গৌরবান্বিত হইয়াছি। আমি এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইতে চলিল, মুসলমানগণ পুণ্য-ভূমি ভারতে প্রথমে পদার্পণ করেন। এই সুদীর্ঘ কাল মধ্যে তাঁহারা লক্ষ লক্ষ ভারতসন্তানকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত

* মনসুর কহেন, শুন কাজি, অপরের পেয়ালা পান করিও না। সোহহম্ বাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেই মন্ত্র পড়াইতে থাক।

করিয়া ইস্‌লাম-শিষ্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়া-ছিলেন। তাহার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি এখন সমানভাবে ভারতের অধিকারী, বলিতে হইবে। বাস্তবিক অনার্য্য হাড়ী, বাগ্দী, মুচী, বাউরী, ডোম প্রভৃতি এবং আদিম অধিবাসী সাঁওতাল, ভীল, কোলাদি জাতিকে বাদ দিলে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান হইয়া দাঁড়ায়।

মুসলমান ভ্রাতাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি আরবী ভাষায় লিখিত। এজন্য তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা সেই প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। যদিও বহু মুসলমান আরব, পারস্য, তুরস্ক, তাতার, কাবুল, প্রভৃতি ভারত-বহির্ভূত রাজ্যসমূহ হইতে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তথাপি পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের বংশধরগণ তত্তৎ দেশের ভাষা ব্যবহার করেন নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দিল্লীপ্রসূত উর্দ্দু ভাষাই তত্রত্য মুসলমানদের মাতৃভাষা হইয়াছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানগণ আপনাদের প্রাদেশিক ভাষাতেই কথাবার্ত্তা ও বাহিরের কাজকর্ম্ম চালাইয়া থাকেন। কিন্তু সেই ভাষাতে ব্যুৎপত্তি লাভের চেষ্টা করেন না। তবে যাঁহারা সাহিত্য-জগতে খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিতে অভিলাষী, তাঁহারা উর্দ্দু ভাষার চর্চ্চাতেই নিযুক্ত। এরূপস্থলে বঙ্গীয় মুসল-মানগণকে বঙ্গভাষাকে আপনাদের মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করত তাহার উন্নতিকল্পে যত্নবান হইতে দেখিলে কাহার না আনন্দ জন্মিয়া থাকে? বাস্তবিক মাতৃস্তন-পানের সহিত মানুষ যে ভাষা শিক্ষা করে ও যে ভাষায় ঘরে-বাহিরে কাজ-কর্ম্ম চালায়, তাহাই

তাহার মাতৃভাষা এবং সেই ভাষার অনুশীলন দ্বারা উন্নতি সাধন করা সকলেরই কর্ত্তব্য ; নচেৎ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃগণের অনেকে বহু দিন হইতে বঙ্গভাষার অনুশীলন করিতেছেন এবং কেহ কেহ উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থকার মধ্যে স্থানও পাইয়াছেন। তন্মধ্যে এই 'মহর্ষি মনসুর' গ্রন্থের প্রণেতা এক জন। ইনি বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। ইহাঁর 'মহর্ষি মনসুর' গ্রন্থপাঠে আমরা বিশেষ উপকার ও আনন্দ-লাভ করিয়াছি।

কোন সঙ্কীর্ণ-হৃদয় গোঁড়া হিন্দু হয় তো পুস্তকের নামকরণে 'মহর্ষি' শব্দ দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ ও আপত্তি করিতে পারেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা, মহর্ষি বলিলেই কেবল ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতের আর্য্য মহাপুরুষগণকেই বুঝাইয়া থাকে ;—পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর সিদ্ধ মহা-পুরুষ থাকাটা যেন তাঁহারা অসম্ভব মনে করেন। তাই তাঁহারা মহাত্মা মনসুরকে মহর্ষি আখ্যা দিতে নারাজ। এরূপ অনুদার মত যাঁহারা পোষণ করিয়া সুখ-বোধ করেন, তাঁহাদিগের সেই মত বা বিশ্বাস কোনক্রমেই সঙ্গত ও সমীচীন নহে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশে হিন্দু-সমাজের বাহিরে অপর ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বহু ঋষিকল্প মহাপুরুষ জন্মিয়া গিয়াছেন এবং এখনও আছেন। মহর্ষি মনসুর এক জন সেই শ্রেণীর স্বনামধন্য মহাজীব। তিনি খলিফাদের রাজধানী প্রাচীন বোগ্‌দাদ নগরের অদূরস্থিত একটী পল্লীতে কোন 'সুফী'-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

'সুফী' শব্দের অর্থ তত্ত্বদর্শী। উহা সম্ভবতঃ গ্রীক 'সোফিয়া'

(Sophia—wisdom) শব্দ হইতে আরবী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ বলেন যে, ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরব, তাতার, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে অনেক অদ্বৈতবাদী পুরুষ বিদ্যমান ছিলেন। কালক্রমে উক্ত দেশসমূহে ইস্‌লাম প্রচারিত হইলে সেই অদ্বৈতবাদীরা ইস্‌লাম গ্রহণ করত 'সুফী' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, অনেক গোঁড়া মুসলমান সুফীদিগকে ইস্‌লামের বিরুদ্ধ-বাদী বলিয়া বিদ্বেষ পোষণ করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা বিরুদ্ধবাদী নহেন, তাঁহারা ইস্‌লামের এক উন্নত জ্ঞানী অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়। তজ্জন্য আবার অধিকাংশ মুসলমান তাঁহা-দিগকে আন্তরিক ভক্তি ও সম্মান করেন।

ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, সকল ধর্ম্মেরই দুইটী বিভাগ আছে। একটী বাহ্য (Exoteric) এবং অপরটী অন্তরঙ্গ বা গুপ্ত (Esoteric)। সুফীগণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ বা গুহ্য তত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী পুরুষ। ধর্ম্মজগৎ ও বিশ্বের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে ইঁহারা কেবল গুরুমুখে উপদেশ পাইয়া থাকেন। এই গুপ্ততত্ত্ব-বিদ্যায় প্রবিষ্ট লোকসকল যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, তাঁহারা সকলেই এক মতাবলম্বী—তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্নতা নাই। ব্যোমযানারোহণে খুব উচ্চ আকাশে উঠিলে যেমন দৃষ্টির সীমা প্রসারিত হয়, নিম্নস্থ বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা, ক্ষেত-খোলা, পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, হ্রদ-সরোবরাদি সমস্তই এক ভাবাপন্ন দেখায়, কাহারও সহিত কাহারও পার্থক্য অনুভব করা যায় না, এ স্থলে ঠিক তাহাই ঘটে। যাঁহারা বাহ্য

বিষয় লইয়াই ব্যস্ত, সুতরাং নিম্নে থাকেন, তাঁহারাই জড়জগতের সম্পত্তির মত ধর্ম্মরাজ্যের বিত্ত-বিভবকেও "এটা আমার, ওটা তোমার, সেটা তাহার" ইত্যাকার পার্থক্যবাচক শব্দ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা স্থাপনের প্রয়াস পান। কিন্তু যাঁহারা উচ্চে উঠিয়া অন্তরঙ্গ-নিহিত গূঢ় সত্যসমূহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা একেবারে ভেদ-জ্ঞান-বিরহিত। এমতাবস্থায় বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মহাবাক্য 'সোঽহম্' এবং মহাতপা মহর্ষি মনসুর-প্রচারিত 'আনাল হক্' যে একসুরে সাধা তান, তাহাতে আর বৈচিত্র্য বা সন্দেহ কি আছে?

মনসুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সৈয়দ জুনেদ শাহের অলৌকিক জ্ঞানধর্ম্মের বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার সমীপে গিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। তদবধি তাঁহার চিত্তের এমন একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে যে, তদ্দর্শনে তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুবর্গ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই পরিবর্ত্তন ও অলৌকিক কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণে অনেককেই তাঁহার নিকট নতমস্তক হইতে হইয়াছিল। ধনকুবের বা পদমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত মনসুরকে দেখিলে যেন উপর হইতে কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমুচিত সম্মান দিতে বাধ্য হইতেন। এই ভাবে কিছু দিন কাটিয়া যাওয়ার পর মনসুর মক্কা যাত্রা করেন। এরূপ শুনা যায় যে, তথায় তিনি এক বৎসরকাল কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন—ধর্ম্মমন্দির কাবার সম্মুখে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্রে ও রজনীর শিশিরে বিনা আচ্ছাদনে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। আহার ছিল দিনান্তে সামান্য এক টুক্‌রা রুটী মাত্র। এই ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক কিছু দিন অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়া আবার মক্কা ধামে গমন করেন।

অতঃপর তিনি বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া কোথায় কি কি কার্য্য করেন, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ভারতীয় উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে দুইটী কবিতামাত্র আমরা শুনিতে পাই। একটী সঙ্গীতাকারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বাইজীদের মুখে গীত হইয়া থাকে।* অপরটী একটু দীর্ঘ—তাঁহার অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যারূপে মৌলবী সাহেবদের মুখে শুনা যায়। † তাহারই শেষাংশ প্রবন্ধের শিরোদেশে প্রদত্ত হইয়াছে। দেশ পর্য্যটনান্তর বোগ্দাদে ফিরিয়া আসিবার পর মন্‌সুরের ধর্ম্মোন্মত্ততার মাত্রা বেশী পরিমাণে প্রকাশ পাইল। একদা তিনি গুরু জুনেদ শাহ্‌কে অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধীয় এমন একটী কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যে, তদুত্তরে গুরুকে বলিতে হইল, "মন্‌সুর! সাবধান, রসনাকে শাসনে রাখিও। নতুবা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কোন্ দিন তুমি রাজাজ্ঞায় প্রাণ হারাইবে।" গুরুর নিকট উৎসাহ না পাইয়া মন্‌সুর নির্জ্জন প্রদেশে যোগাবলম্বন করত সমাধিস্থ হইলেন। কয়েক বৎসর তিনি যোগাসনে ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে নীরব নিস্পন্দভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় থাকিয়া হঠাৎ এক দিন প্রেমের পূর্ণ আবেশে অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—'আনাল্ হক্' (অহম্ ব্রহ্মাস্মি)। এই সংবাদ বোগ্দাদের চতুর্দ্দিকে বিদ্যুদ্বেগে ছড়াইয়া পড়িল; আবালবৃদ্ধবনিতা এক মুখে বলিতে লাগিল, "কি স্পর্দ্ধার কথা! ক্ষুদ্র মানব হইয়া ঈশ্বরত্বের অধি-

* "মোকন্দর্ আপ্‌না আপ্‌না, আজমালে মেসূকা জী চাহে" ইত্যাদি।

† "আগার হ্যায় শওক্ মিল্‌নেকা, তো হরদম্‌ লও লাগাতা যা" ইত্যাদি।

কার! ভক্তের কি এই উক্তি? ইহা নিশ্চয়ই বাতুলের প্রলাপ; মন্‌সুর নিঃসন্দেহ পাগল হইয়াছেন।"

মন্‌সুর যাহা প্রচার করিয়াছিলেন, সাধারণে তাহা বুঝিবে কি প্রকারে? অত বড় একটা দার্শনিক সত্য তখনকার বোগ্দাদী লোকের পক্ষে অবোধ্য হওয়াতে তত দোষের হয় নাই। কিন্তু আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই বা কয় জন সেই 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' মহাবাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন? সাধারণ-ভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই প্রচার করিয়া থাকেন এবং সকলে উহা মোটামুটী বুঝিতেও পারেন। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের গূঢ়ার্থ উন্নত দার্শনিক ব্যতীত আর কাহারও বোধগম্য হইতে পারে না। সাধারণ লোকে যদি বুঝিতে চায়, তবে তাহাদের 'ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ' হইয়া থাকে। এই জন্যই বুঝি, ভারতের তত্ত্বজ্ঞানিগণ মূর্খকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মন্‌সুরের গুরু জুনেদও এই গভীর দার্শনিক সত্য সাধারণ্যে প্রচার করিতে মন্‌সুরকে বারংবার বারণ করিয়াছিলেন। পরন্তু সেই মহাপ্রাণ সরল সাধুপুরুষ হৃদয়ের বেগ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বাধা মানিতে অক্ষম হইয়াছিলেন।

মন্‌সুরের হিতাকাঙ্ক্ষীমাত্রেই তাঁহাকে কত রকমে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কাণ দেন না—কেবল ঊর্দ্ধনেত্রে 'আনাল্ হক্' বাক্যোচ্চারণ করেন। এক দিন বহুসংখ্যক বন্ধু একত্র হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল এবং নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া নিষেধব্যঞ্জক উপদেশ দিতে লাগিল।

তদুত্তরে মনসুর বলিলেন,—"আমার আবার জীবনের আশা কিসের ? আমার কি জীবন আছে ? আমি তো বহু দিন হইল, জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছি ! মৃত ব্যক্তির কিসের ভয় ? যদি তোমরা বল,—তোমার দেহ ও প্রাণ আছে, নতুবা কথা কহিতেছ কি প্রকারে ? কিন্তু ভাই, সে দেহ ও সে প্রাণ তুচ্ছ জিনিস। যাহা এই আছে, এই নাই, তাহার আবার মূল্য কি ? সামান্য কাচখণ্ডের বিনিময়েও তো তাহা কেনা যায় না। তাহার জন্য ভয় কি ? তাহার মমত্ব-যত্নই বা কি নিমিত্ত !" এবংবিধ নির্ভীকতা প্রকাশ করত সকলকে স্তম্ভিত করিলেন এবং সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া নক্ষত্রবেগে বাহিরে আসিয়া আবার সেই প্রাণপ্রিয় 'আনাল্ হক্' শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে পলায়ন করিলেন।

মনসুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এক জন তপস্বিনী ছিলেন। তিনিও এই মহাসত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতার ন্যায় প্রেমে উন্মাদিনী হয়েন নাই। তিনি মনসুরের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করত ভ্রাতাকে একদা বলিয়াছিলেন,—"আমি তো বেগ ধারণ করিয়া আছি, তুমি কেন এরূপ ক্ষেপিলে ? আমি বিশ বৎসর এই তত্ত্বসুধা পান করিতেছি, কিন্তু কখন মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তো বিচলিত হই নাই !" কে কাহার কথা শুনে ? মনসুর অনবরত এক ধ্যানে 'আনাল্ হক্' প্রচার করিতে লাগিলেন।

সিন্ধুতে বিন্দু মিশাইয়া গেলে এক রূপ হয়, পরন্তু বিন্দু মধ্যে সিন্ধু প্রবেশ করিলে বিন্দু আপনাকে স্থির রাখিতে পারে কি না, ইহা ভাবুক জনের ভাবিবার বিষয়। এই জন্য কোন মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন,—

ভূমিকা

"বুঁদ সম্‌হানা সমন্দরমে, সো মানে সব কোই।
সমন্দর সম্‌হানা বুঁদমে, পঁহুছে বিরলা কোই ?"

যাহা হউক, মন্‌সুরের ব্যবহারে সাধারণ মুসলমান-সমাজ একেবারে ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, খোদা-তায়ালা 'হফ্‌ত্‌ তবক্' আস্‌মানের উপর পবিত্র সিংহাসনে চির-বিরাজ করিতেছেন। মন্‌সুর কি প্রকারে তাঁহার পদে বসিতে পারেন ? অতএব মন্‌সুর ঈশ্বরদ্রোহী, সুতরাং প্রাণদণ্ডার্হ। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট ; পরমাত্মা মহান্, জীবাত্মা অণুবৎ। জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, পরমাত্মার অধীন তাহাকে চিরদিনই থাকিতে হইবে। ইহাই ইস্‌-লামের সাধারণ শিক্ষা। এরূপস্থলে যদি কেহ 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাকে ঘোর অপরাধী মহাপাপী মনে করিয়া রাজদ্বারে অভি-যুক্ত করিতে বাধ্য। মন্‌সুরের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। সাধা-রণ প্রকৃতিবর্গ খলিফার নিকট বারংবার বিচারপ্রার্থী হইয়াছিল। কিন্তু মন্‌সুরের ন্যায় বৈরাগী দরবেশের প্রতি কোন দণ্ডবিধান করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তিনি সর্ব্বজনপূজ্য ধর্ম্মাত্মা শাহ্ জুনেদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করেন। জুনেদ শাহ্ অনেক বার প্রত্যাখ্যানের পর শেষে নিতান্ত অনিচ্ছায় মন্‌সুর প্রাণদণ্ডার্হ বলিয়া ব্যবস্থা প্রদান করেন।

তখন সেই ধর্ম্মোন্মত্ত সাধক রাজাজ্ঞায় ধৃত ও কারারুদ্ধ হই-লেন। কয়েকবার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগে তিনি কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া আবার স্বেচ্ছায় তথায় প্রবেশ করেন।

অবশেষে বধ্য ভূমিতে নীত হইয়া সহাস্যবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করত ধর্ম্ম-প্রাণতার অক্ষয় উজ্জ্বল কীর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। ইহাই এ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এই অলৌকিক মর্ম্মস্পর্শী শোকাবহ ঘটনা বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার এ উপহার উপাদেয়, অনুপম ও মূল্যবান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহর্ষি মনসুরের অলৌকিক শক্তির যে সকল দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে গুলি তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট উপহসিত হইতে পারে। পরন্তু অনেক আধুনিক উচ্চ শ্রেণীর পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক উক্ত প্রকারের অলৌকিক ঘটনাবলী (Miracles) বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্বনামধন্য অধ্যাপক মিঃ ব্যারেট বলেন,—তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে যে সকল অনৈসর্গিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তৎসমুদয় বিজ্ঞানের কঠোর নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে নহে। *

* "That a belief in the miracles of the gospel narrative *is consistent with the most rigorous knowledge of the laws and continuity of Nature is shown by the public utterances of* men like Newton, Faraday, Kelvin, Stokes, Clerk Maxwell and others.

"A miracle is essentially the direct control by mind of matter outside the organism, in other words, a supernormal and incomprehensible manifestation of mind. As such miracles did not cease with the apostolic age, but have continued down to the present time.

"To deny miracles because of their incredibility, is to deny the equally incredible but familiar phenomena of the

এ কথা নিউটন, ফ্যারাডে, কেল্‌ভিন, ষ্টোক্‌স্‌, ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি বিজ্ঞান-জগতের মহারথিগণের উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। জড় জগতের উপর মানব-মনের মহাশক্তির প্রভাব দ্বারা এই শ্রেণীর ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে উহা সম্ভব ছিল, এখন নাই, একথা সত্য নহে; মিরাকেল (Miracles) এখনও হইতেছে। মিরাকেল বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়া উড়াইয়া দিলে জীবের জন্ম, দেহের পোষণাদি সুপরিচিত ব্যাপার সমূহেরও অসঙ্গত অলৌকিকতা স্বীকার করিতে হয়। ভুক্ত অন্ন কি প্রকারে রক্তাণুতে পরিণত হয়, এবং তদ্দ্বারা জীব-দেহের ভিন্ন

nutrition, repair, and reproduction of living organisms. What can be more incredible than the transmutation of our food into blood corpuscles, and those corpuscles contributing the precise elements required to repair totally different tissues in our body. Ask the most accomplished chemist with all his laboratory appliances and wide knowledege, to turn a bundle of hay into even a single drop of milk and he acknowledges it to be impossible. But give the hay to the humble cow and the miracle is wrought. How ? Only by the inscrutable directive skill of the sub-conscious life of the animal, taking to pieces the millions upon millions of molecules that lie in the minutest fragment of hay and rearranging those molecules into a new and complex structure—milk, adapted for a particular and predetermined end in view. What presumption to talk about the unfamiliar miracle being incredible, when these familiar miracles are so incredibly wonderful, that we are utterly unable to form any conception of the *modus operandi*."

—*Sir William Barrett.*

ভিন্ন উপাদান কি প্রণালীতে গঠিত হয়, এ সকল কি কম Miracles ? কোন্ সিদ্ধান্ত রাসায়নিক তাঁহার প্রক্রিয়াগারের যন্ত্রাদি দ্বারা এক মুষ্টি তৃণকে দুগ্ধে পরিণত করিতে পারেন? পরন্তু গরুকে ঘাস খাওয়াইয়া আমরা তাহার নিকট হইতে দুগ্ধ লইয়া থাকি। পশুর অজ্ঞাতসারে কোন্ অদ্ভুত প্রক্রিয়া দ্বারা তৃণমুষ্টি তাহার পাকাশয়ে গমন করত নানা অবস্থার ভিতর দিয়া স্তনে উপনীত হইয়া দুগ্ধে পরিণত হয়? তৃণের পরমাণুগুলি কি উপায়ে দুগ্ধের পরমাণু হইল, ভাবিলে মানববুদ্ধি বিকল হইয়া যায়।

ফলতঃ মন্‌সুর-জীবনের অনেক ঘটনাই অতীব আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। কাহার কাহার মনে সে গুলি সমস্ত না হউক, কোন কোন বিষয় অতিরঞ্জিত বা অলীক বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু না—যখন সেই সুদূর অতীত কাল হইতে এ পর্য্যন্ত মন্‌সুর-জীবনী সম্বন্ধীয় অলৌকিক প্রবাদাদি অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিতেছে, তখন আর সে সকল অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই। তবে ইতিহাস ও জীবনচরিতে কিছু না কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সেই সামান্য দোষের জন্য জাজ্বল্যমান সত্যের উপর অনাস্থা স্থাপন করা বিজ্ঞের কার্য্য নহে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন

মহর্ষি মনসুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

মরুময় পুণ্যদেশ আরবের উত্তরাংশে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা ভুবনবিদিতা তুরক্কভূমি। তুরক্কের অগ্নি-কোণস্থিত প্রদেশকে ইরাকে-আরবী কহে।* ইরাকে-আরবীর পূর্ব্ব সীমাসংলগ্ন প্রদেশের নাম ইরাকে-আজ্জম, ইহা ইরাণ (পারস্য) রাজ্যের অন্তর্গত। ইরাকে-আজ্জম প্রদেশও শস্যশ্যামল ও সৌন্দর্য্যের নিকেতন। সেই পুণ্যভূমির প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠা, গুরুত্ব-মহিমা, শোভা-সমৃদ্ধি প্রভৃতির সৌসাদৃশ্য জগতে কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ ভূমিতে প্রকৃতি ভুবনমোহিনী বেশে নিত্য বিরাজিত। ইহার নশ্বর ললিত তরুলতিকা, নয়ন-রঞ্জন কুসুম-কানন ও সুরসাল ফলপূর্ণ শোভন উদ্যান সমূহ দেখিলে ইহাকে যেন ভূস্বর্গ বলিয়া প্রতীয়মান

* নদী তীরবর্ত্তী প্রদেশের নাম ইরাক।, ইরাকে-আরবীর মধ্যে ফোরাৎ (ইউফ্রেটিস্) ও দজ্‌লা (টাইগ্রীস্) নদী প্রবাহিত। জৈহন নদী

হয়—বিয়োগ-বিধুর ব্যক্তি এখানে আসিলে সকল শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া যায়! এমনি ইহার মোহিনী শক্তি! এমনি ইহার চিত্তচমৎকারী সৌন্দর্য্যের বিকাশ! এই বাহ্য সৌন্দর্য্য হইতেই আবার মানবের মানসিক সৌন্দর্য্য গঠিত হয়—মানব আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া থাকে। তাই বুঝি, এই সিদ্ধ স্থানে অনেক সুফী-সাধু জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে অমর কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন; তাই বুঝি, এই ভূমির সেই বিশ্ব-বিদিত শুভ্রশ্রী সিরাজ ও তুস্ নগরের সুসন্তান, পারস্য-কাব্য-কাননের কোমলকণ্ঠ কোকিল মহাত্মা শেখ সাদী ও মহাকবি ফেরদৌসী তুসী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহর্ষি খাজা হাফেজ সিরাজী একদিন সুললিত তানে বিশ্ববসুধা মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আহা এক্ষণে তাঁহারা কত কত মহাপ্রাণ পুরুষের সহিত সেই ভূমিতেই চির বিশ্রাম লাভ করিতেছেন।

ইরাণের এই গৌরবমণ্ডিত প্রদেশের সান্নিধ্যে বয়জা নামে একটী পল্লী অবস্থিত। ইহা ভিন্ন রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও বোগদাদ নগর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। পূর্ব্বকালে এই বয়জা পল্লীতে মনসুর নামে এক অতি ধর্ম্মশীল, বিচক্ষণ ব্যক্তি বাস করিতেন। সত্যনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতা-

গুণে পল্লীস্থ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। শাস্ত্রানু-মোদিত ধর্ম্ম-কর্ম্মসমূহ নিয়মিতরূপে প্রতিপালন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার পুণ্যহস্ত সাধ্যানুসারে দীন-দরিদ্রের অভাবমোচনে প্রশস্ত ও পরোপকারে উন্মুক্ত থাকিত। তিনি ক্ষুধার্ত্তকে আহার, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় প্রদান ও নিঃসহায়কে সাহায্য করাই ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। প্রতি-বাসিগণ তাঁহাকে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ জানিয়া, চিরদিন তদীয় আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিত। ফলতঃ পরম-কারুণিক জগৎপিতা জগদীশ্বর, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন; দয়াময়ের অনুগ্রহে তাঁহার কিছুরই অপ্রতুল ছিল না।

সহধর্ম্মিণী পূর্ণগর্ভা। সেই পতিব্রতা পুণ্যময়ী মহিলা তদবস্থার পালনীয় নিয়ম সকল প্রতিপালনপূর্ব্বক অতি সন্তোষের সহিত গর্ভধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। অনন্তর যথাকালে শুভ লগ্নে তাঁহার একটী সর্ব্ব-সুলক্ষণা-ক্রান্ত পরম সুন্দর তনয়রত্ন জন্মগ্রহণ করিলেন।* পুত্রের

* ইনি ঠিক কোন্ সময়ে জন্ম-পরিগ্রহ করেন, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে অবধারণ করা কঠিন। তবে এইরূপ অনুমিত হয়, আমাদের মহামান্ত পুণ্যপ্রাণ পয়গম্বর হজরত মহম্মদ মোস্তফার (দং) আবির্ভাবের পরে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি ইহজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার

সুবিমল শশধরসন্নিভ কমনীয় কান্তিচ্ছটায় অন্তঃপুর প্রতিভাসিত—তদ্দর্শনে পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তানের শুভ কামনায় একান্তচিত্তে সর্ব্ব আনন্দদাতা বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় অবস্থানুযায়ী অর্থাদি বিতরণে দীন-দুঃখীদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিলেন। তাহারা পরিতুষ্ট হইয়া শিশুকে হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। গৃহ উল্লাসময়—হাস্যভরা। যেন স্বয়ং মুর্ত্তিমান আনন্দ আগমন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। আজ যেন প্রচণ্ডতাপ দিনমণির কররাশি অধিকতর শুভ্র—অধিকতর উজ্জ্বল, অথচ শৈত্যগুণ-বিশিষ্ট। আবার সুশীতল মলয় মারুত মৃদুমন্দপ্রবাহে ঢলাঢলি করত স্ফূর্ত্তি প্রচারে তৎপর হইল। পুরবাসি-গণ এই শুভদিনে আনন্দে উৎফুল্লপ্রাণ। প্রতিবাসী, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবেরাও সে উৎসবে যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত। হাস্য-কোলা-হলে গৃহভূমি শব্দায়মান হইয়া উঠিল।

মহাধ্যায়ী ধর্ম্মপ্রাণ তাপস শেখ আবুবকর শিব্‌লী হিজরী ৩৩৪ সালে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। আবার গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, হজরত ওস্‌মানের পুত্র ওমরের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব ঘটায় তিনি মক্কাভূমি পরিত্যাগ করিয়া বোগ্‌দাদে প্রস্থান করেন। এই ওমর কোন্ সময়ের লোক এবং মহর্ষি তাঁহার সমসাময়িক কি না, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহার মীমাংসা করিয়া লইবেন।

বিধাতার কৃপায় এবং জন-সাধারণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে এই ক্ষণজন্মা শিশু দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিলেন। দিন দিন তাঁহার অঙ্গ-পুষ্টি ও অপরূপ রূপলাবণ্য পরিস্ফুট হইতে লাগিল, পিতা-মাতা পরম যত্নে তাঁহাকে লালন-পালন করিতে রহিলেন। আহা! এ জগতে ভবিতব্যতার কথা কে জানিতে পারে? যে মহাত্মা ঐশী-শক্তি প্রভাবে অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া জগতকে বিমোহিত ও বিস্মিত করিয়া গিয়াছেন, যে দৃঢ়ব্রত সত্যপ্রিয় মহা-পুরুষ ধ্যান-সমাধিতে নিমগ্ন থাকিয়া ধর্ম্মোন্মত্ততার চরম সীমায় সমুপস্থিত হইয়া অকাতরে স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, যিনি তপস্বীকুলের মহাতেজস্বী সিংহস্বরূপ ছিলেন, যাঁহার অপার্থিব বৈচিত্র্যময় জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত এবং হৃদয়-মন বিস্ময়াপ্লুত ও কি এক অভূত-পূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই পুণ্য-সূতিকাক্ষেত্রে এই শিশুরূপে আজ তিনি আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্যবান্ পিতা অনন্তর যথাসময়ে একটী শুভ দিনে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, অতি সমারোহের সহিত তাঁহাদিগকে উপাদেয় পান-ভোজনে প্রীত করিলেন এবং শাস্ত্রসঙ্গত

বিধানানুসারে শিশুকে হোসেন মনসুর নামে আখ্যাত করিলেন।*

হোসেন মনসুর পরিশেষে যে এক জন ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি নামে বিখ্যাত হইবেন, প্রথম হইতেই তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। জন্মদিবসে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কি যেন এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত এবং প্রাণমনোমুগ্ধকর অপার্থিব সৌগন্ধে গৃহ আমোদিত হইতে থাকে ও তদীয় হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর-প্রীতির জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ এক মধুময় ভাব সঞ্চারিত হয়। হাস্যে, ক্রন্দনে, ক্রীড়নে ও হস্তপদাদির সঞ্চালনে সেই ঐশিক প্রেম অভিব্যক্ত! দর্শক শিশুর ভাব-ভঙ্গী দেখিয়াই বিস্ময়াপন্ন ও অজ্ঞান! পিতা-মাতার আনন্দের অবধি নাই। আহা সে আনন্দ, সে স্বর্গীয় প্রফুল্লতা, ঈদৃশ ক্ষণজন্মা পুত্রের ভাগ্যবান্ পিতা ব্যতীত কি অপর কেহ অনুভব করিতে পারে?

এইরূপে দেখিতে দেখিতে ক্রমেই শিশুর জ্ঞান-বিকাশ হইয়া, জিহ্বার জড়তা কাটিয়া গিয়া, মৃদু মধুর

* ইঁহার পিতৃদত্ত নাম হোসেন। সুতরাং আরবীয় প্রথানুসারে পুত্রের নামে পিতার নাম সংযুক্ত হইয়া হোসেন বেন্ মনসুর হইবারই কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই—বেন্ শব্দটী লোপ হইয়া হোসেন মনসুর এবং শেষে কেবল মনসুর নামেই অভিহিত হন। আমরাও তজ্জন্য তাঁহার এই নাম ব্যবহার করিলাম।

আধ আধ ভাষা দূরীভূত হইয়া বাক্যোচ্চারণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তখন বিজ্ঞ পিতা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ দেশের প্রথা অনুসারে মনসুরকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিতে অভিলাষ করিলেন। কিন্তু কি এক অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তিনি সপরিবারে বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য হইলেন। এই স্থানে হোসেন মনসুরের বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়, কিন্তু তাঁহার শিক্ষার পরিণতি হইয়াছিল সোস্তরে। সোস্তর-নিবাসী মহাত্মা সহল্ বেন্ আব্দুল্লা তৎকালে সুপণ্ডিত ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সাধুতা ও শাস্ত্রাভিজ্ঞতা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। মনসুর সেই সুধী পুরুষের নিকটে আসিয়া 'আন্তরিক যত্ন ও প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিক্ষাগুণে যেমন তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইতে চলিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তদীয় অন্তরে ঈশ্বর-প্রীতি, গাম্ভীর্য্য, সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মচিন্তা ক্রমশঃ প্রবলরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এমনি অসাধারণ প্রতিভাশালী, শান্তশীল ও স্মৃতিধর ছিলেন যে, সেই অনন্যদুষ্কর প্রজ্ঞাপ্রভাবে আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালেই ধর্ম্মবিষয়ক বহুবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন।

অতঃপর হোসেন মন্‌সুর শিক্ষাগুরু সহল্ বেন্ আব্‌দুল্লার সংসর্গ ত্যাগ করিয়া ইরাকে-আরবীর দিকে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে এই অঞ্চলে আধ্যাত্মিক বিদ্যার সমধিক চর্চ্চা হইত। সেখানকার বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি রত্ন-লাভাশায় সেই সুগভীর সাধন-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। মন্‌সুরও আসিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার অবিরাম সাধু-সংসর্গ ও তত্ত্বজ্ঞানালোচনা চলিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সুখ-সম্মিলনেও তিনি তৃপ্তি পাইলেন না; তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা—ধর্ম্মপিপাসা উপশমিত হইল না। ঔদাসীন্যের কি যেন এক গাঢ় কুহেলিকা—তত্ত্বানুসন্ধানের কি এক দৃঢ় আবরণ তাঁহার হৃদয়-ভূমি আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। তদীয় অনন্যদুষ্কর অধ্যবসায়-প্রসূত যশঃসৌরভে সকলে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইল বটে, তিনি সাধারণ্যে সমাদৃত ও প্রিয়পাত্ররূপে পরিগৃহীত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ঔদাসীন্য-মেঘজাল অন্তর হইতে অপসারিত হইল না, প্রবল ধর্ম্মপিপাসার শান্তি হইল না, আন্তরিক বাসনা চরিতার্থ হইল না। তখন তিনি এক জন উপযুক্ত দীক্ষাগুরুর আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ যথারীতি বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করেন, আর কোথা গেলে কিরূপে

অভিলষণীয় দীক্ষাগুরু পাইব, এই চিন্তাতেই দিন-যামিনী ম্রিয়মাণভাবে ক্ষেপণ করেন। ভাবনার ভয়ানক কালিমা-রেখা তাঁহার বিস্তৃত ললাটফলকে নিয়ত পরিদৃশ্যমান থাকিত, সর্ব্বদাই অধোভাগে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া কুঞ্চিতনেত্রে কি ভাবিতেন এবং স্বেচ্ছামত স্থানে স্থানে ধর্ম্মমন্দিরে গমনাগমন পূর্ব্বক আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় ফিরিতেন।

বস্‌রা নগরী ইরাকে-আরবীর একটী প্রসিদ্ধ স্থান। তথাকার দৃশ্য-শোভা যেমন মনোরম, অধিবাসিগণও তেমনি সুধী-সজ্জন। সে ভূমি অনেক তত্ত্বালোকপূর্ণ তপস্বীর লীলাস্থলী। সেখানে গেলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে ভাবিয়া সত্যাকৃষ্ট মনসুর বস্‌রা গমন করিলেন এবং ওমর বেন্‌ ওস্‌মান নামক প্রসিদ্ধ সাধকের সংসর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন একটী তত্ত্ব-তর্ক লইয়া মতান্তর ঘটায় তিনি ক্ষুণ্নমনে বস্‌রা ত্যাগ করিয়া বোগ্‌দাদে উপনীত হইলেন।

বোগ্‌দাদ ইরাকে-আরবীর মধ্যে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ সুরম্য নগর। বোগ্‌দাদের অতুলনীয় সুষমাসমৃদ্ধি বর্ণনা করিয়া উঠে, কাহার সাধ্য? জগন্মান্য আব্বাস্‌বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা আবু জাফর মনসুর ১৪৫ হিজরীতে এই নগর প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক এখানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন

করেন এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও সৌষ্ঠবসাধনার্থ রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে মস্‌জিদ্‌রাজি, মিনারশ্রেণী, তোরণমালা, বিদ্যালয়বাটী, প্রমোদ-কানন, রাজপ্রাসাদ, সমাধিভবন ও অপরাপর সৌধনিচয় নির্ম্মিত হওয়ায় ইহা তৎকালে সৌন্দর্য্য-মহিমায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

মহানগর বোগ্‌দাদ প্রাকৃতিক দৃশ্য-শোভাতেও অতুলনীয়। ইহার চতুর্দ্দিকেই শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্র, কুসুম-গন্ধামোদিত উপবন, সুমিষ্ট ফলোদ্যান এবং শান্তি-পূর্ণ বিশ্রাম-বাটী। অদূরে কল্লোলময়ী ফোরাৎ (ইউফ্রেটিস্) নদী প্রবাহিত এবং নগরের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া নির্ম্মল-সলিলা তরঙ্গিণী দজ্‌লা (তাইগ্রীস্) উভয় তীরস্থিত সৌধমালার পাদদেশ বিধৌত করিতে নিয়ত নিরত। সুতরাং ইহার সৌন্দর্য্য-সমৃদ্ধির ইয়ত্তা কোথায়? ফলতঃ বিধাতার কৃপায় পুণ্য-হস্ত-প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্যপ্রভান্বিত আদর্শ নগর কালে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সভ্যতা-শিক্ষার কেন্দ্রভূমি, কত শত ধর্ম্মাত্মা সুফী-সাধুর লীলা-নিকেতন এবং ন্যায়বিচারক বিচক্ষণ নরপতি ও অদীনপরাক্রম বীরবৃন্দের সূতিকাগাররূপে পরিণত হইয়াছিল; ইহার নির্ম্মল যশঃসৌরভ ভূমণ্ডলের নর-নারীগণকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

মহাপ্রাণ মন্‌সুর বোগ্‌দাদের দৃশ্য-শোভা এবং নগরবাসীদের অমায়িক ভাব দর্শনে মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু স্বীয় বাসনা সাফল্যের দিকে আকৃষ্ট থাকায় তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। পরন্তু এ জগতে মঙ্গলময় বিধাতা কাহারও মনোভিলাষ অসম্পূর্ণ রাখেন না। তিনি ক্ষুধার্ত্তকে উপাদেয় আহার, তৃষ্ণাতুরকে সুশীতল বারি, অর্থপ্রার্থীকে বিপুল বিভব, ভোগবিলাসীকে ব্যসনসামগ্রী—ইত্যাদিক্রমে পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের অভিলষিত দ্রব্যাদি দানে পরিতুষ্ট করেন। তিনি প্রার্থনাপূরণকারী, একমাত্র দাতা ও পরম দয়ালু। সুতরাং মন্‌সুরেরও যে এই বাসনা পূর্ণ করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি? সৌভাগ্যক্রমে বোগ্‌দাদ নগরেই পবিত্র সৈয়দ-বংশোদ্ভব খাজা আবুল কাসেম অল্ জুনেদ শাহ্ নামে জনৈক অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পরমপণ্ডিত বাস করিতেন। তৎকালে তাঁহার সদৃশ তত্ত্বদর্শী সিদ্ধ পুরুষ আর কেহই ছিল না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মের অতি গভীর গূঢ় বিষয় সমুদয় তাঁহার নিকট নখদর্পণের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। তাঁহার শিষ্যশাখাও নিতান্ত কম ছিল না। তিনি নিয়ত তৎসমুদয়ে পরিবৃত হইয়া মহানন্দে শাস্ত্রচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

মন্‌সুর মহাজ্ঞানী সৈয়দ জুনেদ শাহের গুণগ্রামের

কথা অবগত হইয়া, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনতি-বিলম্বে তৎসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর সময়ানুসারে অতি নম্রভাবে সৈয়দ সাহেবের নিকট স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলে, সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষ মনসুরের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া কহিলেন,—"ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে অবস্থান করিলে করুণাময় জগৎ-স্রষ্টার কৃপায় তোমার বাসনা সফল হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই।" এতৎ অনুকূল বাক্য শ্রবণে মনসুরের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সর্ব্বসিদ্ধিকর্ত্তা নিখিল-নাথকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, প্রফুল্লচিত্তে দিবারজনী গুরু-পদসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইয়া গেল। মনসুরের ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ, প্রগাঢ় গুরুভক্তি, চিত্তহারী বিনয়-নম্রতা এবং অচলা সহিষ্ণুতা দর্শনে সৈয়দ সাহেব নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার এতাদৃশ অসহ্য পরিশ্রমের পারি-তোষিক প্রদান মানসে এক দিবস কৃপাবলোকনে ঈষৎ হাঁসিয়া কহিলেন, "মনসুর! আমি তোমার ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অধ্যবসায়, তোমার গুরুভক্তি, তোমার শিক্ষানুরাগ, তোমার চরিত্র-বল, তোমার আলাপ-সম্ভাষণ—সকলই মধুর, সকলই প্রশংস-নীয় এবং অনুকরণযোগ্য। তোমার হৃদয়-ভাব অতি

উচ্চ ও মহান্। জগতে পরিশ্রমের পুরস্কার অবশ্যই আছে। অতএব যাও, অবগাহন করিয়া আইস, আজ আমি তোমাকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।”

গুরুর এই অনুকূল বাক্য শ্রবণে শান্তশীল মনস্থর হৃষ্টচিত্তে মস্তক অবনত করিয়া,যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন এবং মঙ্গলময়ের অনুগ্রহে অদ্য আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল বলিয়া অবিলম্বে স্নানকার্য্য সমাপনান্তে শুদ্ধচিত্তে হস্তপদাদি প্রক্ষালন (অজু) পূর্ব্বক অঙ্গশুদ্ধি করত পবিত্রভাবে পূজ্যপাদ গুরুর সম্মুখীন হইলেন। তখন মহানুভব সৈয়দ সাহেব শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থানুসারে মনসুরকে প্রথমতঃ ‘তওবা’ * করাইয়া লইলেন। পরে ইহ-পরকালের কঠোর যন্ত্রণার পরিত্রাণ-পথ প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে একে একে তন্ন তন্ন করিয়া ধর্ম্মের যাবতীয় সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। সাধুসমাজের স্পৃহণীয় আধ্যাত্মিক গুপ্ততত্ত্বের এরূপ্ বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন যে, তাহাতে যেন মহানৃশক্তি জগৎস্রষ্টার পবিত্র সত্ত্বা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন। ফলতঃ বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ ফলপ্রসূ হয়, মনসুরের পক্ষে এই গুরূপদেশও তদ্রূপ ফলোপধায়ক

* তওবা—অনুশোচনা বা কৃতাপরাধের জন্য জগৎস্রষ্টার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা এবং পুনর্ব্বার তাহা না করণের দৃঢ়তা।

ও শুভজনক হইল; তিনি একাগ্রমনে তৎসমুদয় শ্রবণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। এইরূপে প্রসন্নচিত্তে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহের সহিত হৃদয় খুলিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াতে হোসেন মন্‌সুরের অন্তরাকাশ পরিষ্কৃত ও জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইল। তাঁহার হৃদয়ের সেই তিমিরজাল অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হইল; যেন কোন মোহনীয় মন্ত্রপ্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক অলৌকিক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। মন্‌সুর নব-জীবন প্রাপ্ত হইলেন। একে তিনি স্বতঃই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে আবার গুরুদত্ত শিক্ষাবল পাইয়া তাঁহার সেই স্বাভাবিক প্রখর প্রতিভা অধিকতর তেজস্বিনী হইয়া উঠিল; তিনি ঐশিক-প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া একেবারে উন্মত্তবৎ হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যাবিশারদ, গভীর-তত্ত্বজ্ঞ, সাধুকুল-শ্রেষ্ঠ সৈয়দ খাজা জুনেদ শাহ্ কর্ত্তৃক দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া হোসেন মনসুরের ধর্ম্মানুরাগ ও জ্ঞানান্বেষণ-বাসনা অত্যধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল। তাঁহার চিত্তভূমি প্লাবিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিদ্যুল্লহরী, আবির্ভূত হইতে লাগিল। জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হওয়াতে তিনি নশ্বর জগতের মোহময় মায়াজাল ছিন্ন করিয়া আপনাকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অথবা আমি এ মর-জগতের কিছুই নহি বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হইতে লাগিল। ফলতঃ অচিরকাল মধ্যে তিনি দেশ মধ্যে এক জন পরম তত্ত্বদর্শী ভাবুক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। সমগ্র খ্যাতনামা পণ্ডিত ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি মনসুরের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও অচিন্তনীয় কার্য্যকলাপ দৃষ্টে বিস্মিত হইয়া নীরবে মস্তক অবনত করিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহার শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম হইল না। অবিনশ্বর ধন—পরমতত্ত্ব অবগত হইবার বাসনায় বহুসংখ্যক লোকের নিত্য সমাগম হইতে লাগিল;

অনেকে অহর্নিশ তদীয় পদ-সেবায় নিযুক্ত। কিন্তু তিনি নিরন্তর নেত্রযুগ নিমীলন করিয়া স্থিরচিত্তে বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া, কি এক গভীর চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। সে যে কি চিন্তা, তাহা তিনি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে কেবল সেই এক চিন্তা ব্যতীত অপর কিছুই স্থানলাভ করিতে পারিত না। দিবসে আহারে ব্যস্ত নহেন, নিশিতেও নিদ্রা বা বিশ্রাম নাই, কেবল অবিশ্রান্ত জাগ্রদবস্থায় স্তব্ধভাবে কি যে যোগসাধনে নিরত থাকিতেন, তাহা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ভাবুক ব্যতীত অপর সাধারণে বুঝিতে অক্ষম।

এই সময়ে মহর্ষি সাধু-সহবাসে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভের কামনায় দেশ-পর্য্যটনের বাসনা করেন। তদনুসারে তিনি তস্তরে আগমন করিয়া তত্রত্য সাধুপ্রবর আব্দুল্লা তস্তরীর সহবাসে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তৎপরে বস্‌রা, মক্কা, খোরাসান, শিস্তান, কেরমান, মাওরান্নাহার, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশ ও বহু নগর পরিভ্রমণ করিয়া, বহু সাধু লোককে সন্দর্শন করেন। আমরা এস্থলে তাহার সেই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের কয়েকটী অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

তপোধন বহুবার পবিত্র মক্কাভূমি পরিদর্শন ও তথায় অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন

করেন। একবার তিনি চারি শত ধর্ম্মার্থী সহচর সহ তথায় গমন করেন এবং যথানিয়মে হজ্-ব্রত পালন পূর্ব্বক সঙ্গীদিগকে বিদায় দিয়া স্বয়ং মক্কাবাস করেন। এবার তিনি সেই পুণ্যক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইয়া স্বীয় ধৈর্য্যশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি সুবিখ্যাত বায়তোল্লাহ্অর্থাৎ ধর্ম্মমন্দির কাবা মসজিদের সম্মুখভাগে সমস্ত দিবস প্রচণ্ড সৌর-রশ্মি-তলে অকাতরে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শরীরে আচ্ছাদন মাত্র দিতেন না, প্রখর সূর্য্যের অগ্নিকণা সদৃশ অসহ্য কর-প্রভাবে তাঁহার শরীর বহিয়া অজস্রধারে স্বেদ-ধারা বিগলিত হইয়া ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত করিয়া ফেলিত এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। কষ্টের অবধি ছিল না; কিন্তু তাহাতেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই। তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল, চিত্ত বিকাররহিত ও উচ্চশির গিরি সদৃশ অদম্য, অচল ও অটল; মুখে আহা শব্দটীও বহির্গত হইত না। দিবানিশি কেবল প্রস্তর-প্রতিমাবৎ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। সেই সময়ে একখণ্ড রুটীর সামান্য অংশ মাত্র তাঁহার দৈনিক আহার ছিল। এইরূপ কঠোর তপস্যায় মহাতপা মনুস্থর পূর্ণ এক বৎসর কাল অতি-

বাহিত করেন। কি অবিচলিত ভীষণ অধ্যবসায়! ইহা ভাবিয়া দেখিলেও মস্তক বিঘূর্ণিত ও সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে; এরূপ অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা প্রকৃত সাধক ব্যতীত অপরের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে।

মহর্ষি মক্কা অবস্থানকালে একদা আরাফাতের প্রান্তরে প্রার্থনা করিতে গমন করেন। তথায় প্রার্থনা-কালে বলেন, "হে করুণাময় জগৎপতে! হে বিশ্বপ্রাণ! হে প্রেমময় দীনবন্ধো! আমার কার্য্যকলাপের দ্বারা জগৎ যদি আমাকে মহাপাপী ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়াই পরিগণিত করিয়া থাকেন, তবে হে দয়াময়! আমাকে সেই অবস্থাতেই উন্নতি করিতে শক্তি দান করুন।" এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা তিনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে কতক-গুলি লোক দেখিতে পাইলেন; অমনি তাঁহার কণ্ঠ-স্বর রুদ্ধ হইল,—কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলেন; নিকটে একটী বালুকাস্তূপ ছিল, ত্রস্তভাবে তাহারই অন্তরালে যাইয়া আত্মগোপন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তিনি দেখিলেন, প্রান্তর জনশূন্য হইয়াছে, প্রকৃতি নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে, দৃষ্টিসীমার মধ্যে মানবের চিহ্নমাত্র নাই, তখন তিনি বহির্গত হইয়া আবার ব্যাকুলচিত্তে, কাতরকণ্ঠে অবিশ্রান্ত প্রার্থনায় নিরত হইলেন।

ঋষিবর কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। সংসারের আবল্য-জাল হইতে পৃথক থাকিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান-ধারণা করাই যে তাঁহার এই নির্জ্জন-নিবাসের প্রধান কারণ ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। তৎপরে পারস্য রাজ্যে গমন করেন। তথায় অবস্থিতিকালে মহর্ষি কয়েক খানি তত্ত্বোপদেশপূর্ণ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থনিচয় এরূপ গভীর গবেষণা-প্রসূত যে, অনেকানেক জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতের বহুদর্শনকেও তাহাতে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অতঃপর তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে বহু সংখ্যক যাত্রিক সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার পুণ্যক্ষেত্র মক্কায় আসিয়া উপনীত হন। এবার তিনি মক্কায় অধিক দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। কারণ এক জন নষ্টবুদ্ধি দুরন্ত লোক তাঁহাকে যাদুকর ভণ্ডযোগী বলিয়া দুর্ণাম রটনা করে। তজ্জন্য তিনি ক্ষুণ্নমনে মক্কাতীর্থ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

তাপসরাজ সুদূরবর্ত্তী ভারতবর্ষে আসিতেও ত্রুটি করেন নাই।* তিনি আশা করিয়াছিলেন, ধর্ম্মভ্রান্ত

* ঋষিরাজ ভারতের কোন্ প্রদেশে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিয়াছিলেন, কত দিন ছিলেন এবং কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইবার উপায় নাই।

ভারতের অসার পৌত্তলিকতা-অধর্ম্ম অপনোদন করিয়া তৎস্থলে যথার্থ এবং জগদীশ্বরের মনোনীত নিরাকার একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিব,—অধিবাসীদিগকে সদুপদেশ প্রদানে সত্যপথে আনয়ন করিব। কিন্তু তাঁহার সেই আশা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা যায় না। ফলতঃ এইরূপে তিনি বহু স্থানে গমন পূর্ব্বক লোকদিগকে বিবিধ প্রকারে সৎশিক্ষা প্রদান ও বহু সাধু-সহবাস করেন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সকল স্থান হইতেই তাড়িত হইয়াছিলেন, কুত্রাপি সুনাম অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ মহর্ষি যেরূপভাবে তত্ত্ব-কথা বলিতেন, অল্পবুদ্ধি লোকেরা তাহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অপবাদ রটনা করিত; এমন কি, অনেকে প্রকাশ্যে তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার বীর-হৃদয় অচল অটল,—দমিত হইবার নহে; তাহাতে তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও নিরুৎসাহিত বা ভগ্নোদ্যম হইতেন না, স্থির-মনে স্বীয় গন্তব্য পথের অনুসরণ করিতেন।

তপোধন বহু দিবস নানা দিগ্‌দেশ পর্য্যটন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। দীক্ষাভূমি বোগ্‌দাদে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্মোন্মত্ততা চরম সীমায় সমুপস্থিত হয়। কথিত আছে, একদা তিনি স্বকীয় দীক্ষাগুরু তপস্বিকুল-

ভূষণ খাজা সৈয়দ জুনেদ শাহ্‌কে একটী প্রশ্ন করেন। সৈয়দ সাহেব তদুত্তরে বলেন, "মন্‌সুর! সাবধান, ধীরতার সীমা অতিক্রম করিও না, রসনা শাসনে রাখিও। নতুবা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, কোন্ দিন তুমি শূলাগ্রে আত্মবিসর্জ্জন পূর্ব্বক বধ্যভূমি অনুরঞ্জিত করিবে।" প্রশ্নের উত্তরে এই কঠিন কথা শুনিয়া স্পষ্ট-বাদী নির্ভীক মন্‌সুর খাজা জুনেদ শাহ্‌কে বলিলেন, "হাঁ, আমার সে শুভ দিন নিকটবর্ত্তী বটে, কিন্তু জানিবেন, তৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আপনাকে সুফীর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া শাহ্‌ জুনেদ নিস্তব্ধ ও নিরুত্তর। মন্‌সুর ত্বরিতপদে প্রস্থান করি-লেন। ফলতঃ গুরুশিষ্য উভয়েরই এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। অতঃপর সে ঘটনা পাঠকগণের গোচরীভূত হইবে।

অনন্তর সাধকপ্রবর নির্জ্জনে যোগসাধনে উপবেশন করিলেন; আহার, বিহার, বিশ্রাম, নিদ্রা প্রভৃতি মানব-স্বভাব-সুলভ যাবতীয় ইন্দ্রিয় সম্পর্কীয় কার্য্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন রহিলেন। কেবল সেই একই ভাব—সেই ফল্গু-নদীর অন্তঃপ্রবাহ—সেই বাহ্য-জ্ঞানশূন্যতা—সেই ধ্যান-স্তিমিত নেত্র!—নীরব ও নিস্পন্দ! মশক-মক্ষিকাদির উপবেশনে দূরে থাক,

দংশনেও গাত্র স্পন্দিত নহে। এই অবস্থায় দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। এক দিন, দুই দিন করিয়া ক্রমে সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, মাসের পর বৎসর, এইরূপে কত দিন, কত সপ্তাহ, কত পক্ষ, কত মাস, কত বৎসর চলিয়া গিয়া অনন্ত কালের গভীর গর্ভে বিলয়প্রাপ্ত হইল, জগতের কত স্থানে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল, কত মানবের ভাগ্য-চক্রের ঘূর্ণনে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিল, কিন্তু মনসুরের এই ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না,—স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ নিরন্তর নিরাময় নিখিলনাথের ধ্যান-ধারণায় নিবিষ্ট;—সাধন-সমুদ্রের অন্তস্তলে নিমজ্জিত হইয়া নিজ্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায় নিশ্চল রহিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত সহস্র আনন্দোৎসব, সুমধুর বাদ্যভাণ্ড, বা কোনরূপ ভীষণ অনিষ্টপাত হইলেও তদীয় চিরায়ত্ত চক্ষু-কর্ণ ভ্রমেও তদনুসরণে ধাবিত হইত না। ফলতঃ তিনি সংসার-আবল্য-জাল হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া, মায়া-মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্য-অন্তঃকরণে খোদার প্রেমে উন্মত্ত থাকিতেন। সে প্রেমের মর্ম্ম কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু আগ্নেয় গিরির গহ্বরাভ্যন্তরে অনলরাশি পরিপূর্ণ হইলে, গিরি অগ্নি উদ্গীরণ না করিয়া কি আর স্থির থাকিতে পারে? পাত্র

পূর্ণ হইলে বারি স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আহা! এক দিবস অকৃত্রিম ধার্ম্মিক প্রেমোন্মত্ত মনসুর প্রেমের পূর্ণ আবেগে অস্থির হইয়া উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া ফেলিলেন—"আনাল্ হক্" (অহং ব্রহ্ম বা আমিই ঈশ্বর)! উঃ কি ভীষণ অধর্ম্মের কথা! কি পাপের কথা!! কি স্পর্দ্ধাজনক অন্যায় উক্তি!! রক্তমাংসময় নশ্বর মানবে—ইন্দ্রিয়ের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চালিত দুর্ব্বল মানবে—জলবিম্ববৎ ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র মানবে ঈশ্বরত্বের অধিকার!! গোষ্পদে বিশাল বারিনিধির আরোপ!!! ইহা কি উন্মত্তের প্রলাপ নহে? ভক্তের কি এই উক্তি? কখনই নহে। সকলে ইহা শুনিয়া বিস্মিত ও চকিত হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় নীরবে চাহিয়া রহিল।

এদিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ নগরময় প্রচারিত হইতে আর বাকি রহিল না। যে শুনে, সেই স্তম্ভিত, সেই হতচৈতন্য। নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। বোগ্দাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্ব সমাজেই এই একই কথা—একই বিষয়ের আন্দোলন! কেহ কেহ, "হায় ধর্ম্মপ্রাণ মনসুর পাগল হইয়াছেন" বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-গণ মনসুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "ভাই! তোমার মনে এ বিকৃতি জন্মিল কেন? তুমি কি

উন্মত্ত হইয়াছ ? তুমি এক জন পরম জ্ঞানী, তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমাদের অনধিকার-চর্চ্চা ও ধৃষ্টতামাত্র ! তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতেছি, সাবধান, সাবধান ! জান ত, এ ধর্ম্মবিগর্হিত নিদারুণ পাপ কথা। একথা পুনর্ব্বার উচ্চারিত হইলে তোমার সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এমন কি, ইহাতে তোমার জীবনের আশা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব স্থির হও, যাহাতে এই কুচিন্তা অন্তর হইতে বিদূরিত হয় এবং চিত্ত প্রকৃতিস্থ ও সুস্থ হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক ও সচেষ্ট হও। এ উক্তি তোমার পক্ষে,—তোমার কেন ? জগতের কোন লোকের পক্ষেই মঙ্গলজনক নহে। তাই পুনর্ব্বার বলিতেছি, তুমি আপনাকে জগতের শত্রু করিও না ! চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন কর।” ইত্যাকার কতই প্রবোধ প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উত্থিতফণা ফণী মন্ত্রৌষধ গ্রাহ্য করিল না ! এ মন্ত্রে কোনও ফলোদয় হইল না,—সকলই অসাধ্য ও ব্যর্থ হইল। প্রেমমুগ্ধ মনসুর এ সান্ত্বনা-বাক্যে ভুলিলেন না। প্রবহমানা স্রোতস্বতীর দিগন্তগ্রাসী প্রবল প্রবাহ রোধ করে, কাহার সাধ্য ? তিনি নরলোক-দুর্লভ শান্তি-সুধাপ্রদ প্রেম-পারাবারের গভীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া আছেন, লোকের নিষেধ-বাক্যে সেই

চিরসুখের স্থান কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? সুখময় সরল পথ ছাড়িয়া কোন্ ব্যক্তি কণ্টকাকীর্ণ বক্র পথে পদার্পণ করে? ফলতঃ শত যত্নেও মনসুরের মানসিক গতি আর ফিরিল না—সুহৃদ্বর্গের উপদেশ উপেক্ষিত হইল। তিনি উপহাসব্যঞ্জক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং গম্ভীরভাবে বলিলেন,—

"আনামান্ আহোয়া ওয়ামান্ আহোয়া আনা,
নাহ্‌নো রুহানে হালালনা বদানা।
ফা এজা আব্‌সারতানী আব্‌সারতাহু,
ওয়া এজা আব্‌সারতাহু আব্‌সারতানা।"

আমিই তিনি—যাঁহাকে আমি চাহি—আমি ভালবাসি এবং যাঁহাকে আমি চাহি—আমি ভালবাসি, তিনিই আমি। আমরা দুইটী আত্মা এক দেহে আছি। এই হেতু তুমি যখন আমাকে দেখ, তখন তাঁহাকে দেখিবে এবং যখন তাঁহাকে দেখ, তখন আমাকেও দেখিবে। ফলতঃ আমাকে দেখিলেই তোমাদের তাঁহাকে দেখা হইবে। তোমরা আমাকে জীবনের ভয় দেখাইতেছ কি জন্য?—আমার আবার জীবনের আশা কিসের? আমার কি জীবন আছে? আমি তো ইতিপূর্ব্বেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছি! আমি যে মৃত! মৃতের কি পার্থিব ভয় বা জ্বালা-যন্ত্রণা আছে? না কখন হইতে

পারে? অথবা যদিই আমার জীবন থাকে, তবে তাহা তো অতি তুচ্ছ পদার্থ! যাহা এই আছে, পর মুহূর্ত্তে নাই, সে ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের মূল্যই বা কত? সামান্য কাচখণ্ডের বিনিময়েও তো তাহা ক্রয় করিতে পারা যায় না। সেই অকিঞ্চিৎকর পদার্থের জন্য আবার ভয় কি? তাহার মমতা-যত্নই বা কি জন্য?" ইহা বলিয়া ধর্ম্ম-মদমত্ত মন্‌সুর ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ "হক্ হক্ আনাল্ হক্" স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহর্ষি মনসুরের ধর্ম্মোন্মত্ততার বিষয় পুস্তকান্তরে অন্য-রূপ বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য সেই কৌতুকাবহ ঘটনাটীও এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

ইহা ভারতীয় মুসলমান সাধকবৃন্দের শিরোভূষণ ও তত্ত্বজ্ঞানের সমুজ্জ্বল সূর্য্যস্বরূপ মহিমার্ণব সিদ্ধ পুরুষ হজরত খাজা কোতব্‌উদ্দীন বক্তিয়ার কাকী সাহেবের কথা, সুতরাং বিশ্বস্ত, মুল্যবান্ ও সারগর্ভ তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি একটী দরবেশ-বৈঠকে নিগূঢ় ধর্ম্ম-তত্ত্বের প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ প্রকাশ করেন যে, মহর্ষি হোসেন মনসুরের একটী ধর্ম্মপরায়ণা জ্যেষ্ঠা সহোদরা ছিলেন। তিনি নির্জ্জনে অনন্যমনে যোগ-সাধনের নিমিত্ত নিত্য নিশীথ সময়ে নগরবহির্ভাগে এক নিবিড় অরণ্যে গমন করিতেন এবং যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে নিরাময় নিখিলনাথের ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইতেন। ইহাই তাঁহার নিত্য তপস্যার নিয়ম ছিল। উপাসনান্তে যখন তাঁহার প্রত্যাগমনের সময় উপস্থিত হইত, তখন দৈব আজ্ঞাক্রমে নিয়োজিত একটী স্বর্গীয় দূত, শুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ ঐশিক প্রেমামৃতপূর্ণ একটী সুদৃশ্য

পানপাত্র হস্তে লইয়া তথায় শুভাগমন করিতেন এবং তাহা সেই পুণ্যবতী রমণীকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রদান করিতেন। রমণী হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক পাত্র গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লবদনে সেই দিব্য সুধা পান করত গৃহাভিমুখিনী হইতেন।

কি একটী ঘটনায় এই গোপনীয় ব্যাপারের আভাস-মাত্র মনসুর অবগত হন। প্রতিদিন নিশীথসময়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া ভগিনী একাকিনী কোথায় গমন করেন? তপস্যার জন্য? অথবা কি কারণে? এ রহস্য অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার অন্তরে অতীব ঔৎসুক্য ও উদ্বেগ জন্মে। তিনি স্বয়ং নিদ্রিত ভাণে জাগরিত থাকিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত সতৃষ্ণনয়নে ভগিনীর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদা সুযোগ উপস্থিত হইল। তাঁহার ভগিনী নিয়মিত সময়ে সকলের অজ্ঞাতসারে গাত্রোত্থান করিয়া নিস্তব্ধভাবে গন্তব্য স্থানা-ভিমুখে চলিলেন। অমনি মনসুরও গুপ্তভাবে নিঃশব্দ পদ-ক্ষেপে অতি সন্তর্পণে তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অগ্রে ভগিনী, পশ্চাতে ভ্রাতা,—উভয়ে নিশার নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া চলিতেছেন, ভ্রাতা ভগিনীর গোচরী-ভূত হইতেছেন না। ক্রমে নগরের শোভন উদ্যান ও অট্টালিকাশ্রেণী অতিক্রম করিয়া একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তরে

আসিয়া পড়িলেন। তথাপি গমনে বিরাম নাই—প্রান্তর পার হইয়া ক্রমে একটী নিবিড় অরণ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কুত্রাপি জনপ্রাণী নাই, প্রকৃতি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া শান্তিসুখে বিশ্রাম করিতেছেন। আকাশে আজ চন্দ্র অদৃশ্য; কিন্তু লক্ষ লক্ষ তারকা প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় আপনাদের ক্ষীণ রজতরশ্মি বিতরণ করিয়া নৈশ তমিস্রের তরলতা সম্পাদন করিতেছে। এহেন সময়ে এই দুর্গম স্থানে সরলা কুলমহিলা একাকিনী !—এক দিন নহে, প্রত্যহ একাকিনী আগমন করেন! কি ভয়ানক কথা, ইহা প্রকৃতই অবৈধ ও দুঃসাহসের কার্য্য। অন্তঃপুরবাসিনী কোমলহৃদয়া কুলাঙ্গনার সৌম্য স্বভাবে একার্য্য কখনই শোভা পায় না। মন্সুর চিন্তাকুলচিত্তে ইহাই ভাবিতেছেন। তাঁহার ভগিনী কিন্তু স্বীয় কার্য্য সাধনে বিব্রত। তিনি বৃক্ষশ্রেণী-সমাকীর্ণ এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া অরণ্যের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করিলেন এবং এক বৃক্ষতলে লতাপল্লব-রচিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

স্থানটী অতি মনোরম! চতুর্দ্দিকে ঘন সন্নিবেশিত তরুগুল্মরাজি প্রাকৃতিক প্রাচীররূপে বিরাজিত, মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ বিটপী ঘন পল্লববিশিষ্ট শাখা-প্রশাখা বিস্তার

পরিষ্কৃত—পরিচ্ছন্ন! যেন মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা ও স্বর্গীয় মাধুর্য্যে স্থানটী পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ ইহা সাধনার উপযুক্ত আশ্রম বটে। এখানে আসিয়া মনসুরের ভক্তিনদী স্বতঃই উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে মহিমময় মহীশ্বরের উদ্দেশে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিলেন। যে সন্দেহবশে তিনি ভগিনীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা তিরোহিত হইল,—শ্রদ্ধাপূতচিত্তে তখন ধর্ম্মশীলা ভগিনীকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার শেষ কার্য্যকলাপ দর্শনেচ্ছায় কিঞ্চিৎ দূরে লতাগুল্মের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন-ভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

তপস্বিনী তপোমগ্না—বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা। তিনি বিশ্ববিধাতার ধ্যাণ-ধারণায় দেহ-প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছেন। নীরব—নিস্পন্দ! প্রস্তর-প্রতিমার ন্যায় যোগোপবিষ্টা। এ যোগ শত বজ্রপাতেও ভঙ্গ হইবার নহে। আহা কি অলৌকিক—কি অনির্ব্বচনীয় তপশ্চারণ! ধন্যা রমণী!! ধন্য তাঁহার হৃদয়বল!! তখন মনসুর বুঝিলেন, তাঁহার ভগিনী সামান্যা রমণী নহেন।

এই অবস্থায় যামিনীর যামত্রয় অলক্ষ্যে অতিবাহিত হইয়া গেল। রমণী যথাকালে কঠোর সাধন-সমাধি ভগ্ন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। যেমন দণ্ডায়মান, অমনি

সহসা কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল—বনমধ্যে আলোকচ্ছটা ভাসিয়া গেল,—পরক্ষণেই এক শুভ্রকান্তি দেব-দূতের আবির্ভাব! দূত-বরের হস্তে পানপাত্র—উজ্জ্বল পানীয়পূর্ণ; তাহা হইতে স্বর্গীয় সৌরভ মনঃপ্রাণ মাতাইয়া বহির্গত হইতেছে। শুদ্ধচারিণী শুভ্রমতি সুশীলা মহিলা অতি যত্নে পরমাগ্রহে পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভক্তি-গদগদচিত্তে তাহাতে শ্রীমুখ সংযুক্ত করিয়া পান করিতে আরম্ভ করিলেন। কি সে সুধা, কে জানে? মনস্বী মনসুর অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত দেখিতেছেন; দেখিয়া বুঝিলেন,—পাত্রস্থ পানীয় অপার্থিব, দৈব-প্রেরিত ও দৈবগুণ-সম্পন্ন, সন্দেহ নাই। যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, অস্থি-মাংস-মজ্জা-রক্ত-গঠিত যে মানব ন্যায়-নিষ্ঠা-সদাচার-বলে বলীয়ান্, স্বয়ং করুণাময় বিশ্বপতি যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট, তিনিই এই দেবদুর্লভ পবিত্র স্বর্গামৃত পানের অধিকারী! তিনিই ধন্য! আহা পুণ্যকর্ম্মফলে আমার স্নেহময়ী ভগিনী যখন সেই অমৃত-ভাণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পান করিতেছেন এবং ভাগ্যক্রমে আমিও তাঁহার নিকট উপস্থিত আছি, তখন ঐ জগৎলোভন অমূল্য পদার্থের অংশ গ্রহণ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এ শুভ সুযোগ পরিত্যাগ করা কোন-ক্রমেই উচিত নহে। ইহাই স্থির করিয়া মনসুর উচ্চ-

কণ্ঠে ব্যস্ততা ও বিনয় নম্রতার সহিত বলিলেন, "ভগিনি ! ভগিনি ! ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, সমুদয় পান করিবেন না, আমাকে কিঞ্চিৎ দিবেন," ইহা বলিতে বলিতে তাঁহার দিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অকস্মাৎ এ কি ! এ কাহার কণ্ঠস্বর ! কে এ গভীর নিশাকালে এ নির্জ্জন বনপ্রদেশে আসিল ? রমণী চকিত ও বিস্মিত হইয়া পান-পাত্র হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দেখেন, সম্মুখে ভ্রাতা মনসুর। মনসুর ? কিরূপে কখন্ এখানে আসিল মনসুর ? মনসুর কেমনে এ সংবাদ জানিতে পারিল ? হায় হায়, তবে ত সে আমার গুপ্ত-সাধনক্রিয়া সমস্তই জানিতে পারিয়াছে ! সাধের ষড়যন্ত্র আমার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! অহো অদৃষ্ট ! এত দিনে আমার সমুদয় পরিশ্রমই পণ্ড হইল !! পুণ্যময়ী রমণী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে এইরূপ অনুশোচনার সহিত ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—"মনসুর ! মনসুর আসিয়াছ ? উত্তম। পান করিবে ? কর ; কিন্তু ভাই ! এ পানীয়ের জ্বালাময় প্রভাব তোমার ক্ষুদ্র—দুর্ব্বল প্রাণ সহ্য করিতে পারিবে না।" মনসুর এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না—ব্যগ্রতার সহিত হস্তপ্রসারণ-পূর্ব্বক পান-পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং ভগিনীর পানাব-শিষ্ট যে অতি সামান্য পানীয় ছিল, তাহাই ভক্তিভাবে—

ব্যস্ততার সহিত পান করিলেন। কি আশ্চর্য্য !! পর-ক্ষণেই ভগিনীর ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল। পান করিয়াই মনসুর উদ্‌ভ্রান্ত—বিভোর—আত্মহারা হইলেন, বিশ্বের বিভব তাঁহার নয়নে বিভাসিত হইল; তিনি বিস্ফারিত লোচনে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"আনাল্‌ হক্‌, আনাল্‌ হক্‌, আনাল্‌ হক্‌"।

চুপ্‌—চুপ্‌—চুপ্‌! মনসুর স্থির হও—থাম। তোমার কি হিতাহিত জ্ঞান নাই !! ও কি কথা বলিতেছ ? উহা মুখাগ্রে আর আনিও না। এ অতি অবৈধ কথা ! কিন্তু হায়, শুনিবে কে ? মনসুর অজ্ঞান। তখন এ অনুযোগ অনুরোধ কোন ফলোপধায়ক হইল না, দেখিয়া চারু-শীলা তপস্বিনী বাণবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় হা-হুতাশ ছাড়িয়া ব্যথিত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মনসুরকে কহিলেন, "রে অবোধ ! রে সংকীর্ণচেতা ! আমি কি বলি নাই, এ পানীয় তেজোময়—ইহার প্রভাব তুমি সহ্য করিতে পারিবে না ! ফলতঃ তুমি কেবল আমার ধর্ম্মব্রত পালনের পথে কণ্টক স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হইলে, তাহা নহে, আমার জীবনের মহান উদ্দেশ্য নষ্ট করিলে। আরও আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুমি অতঃপর আত্মসম্মান নষ্ট করিবে, কলঙ্কিত হইবে এবং আমাকেও সেই কলঙ্কের অংশভাগিনী করিবে"।

ইহা বলিয়া সেই তেজস্বিনী রমণী চঞ্চল চরণে আলয়াভি-মুখে অগ্রসর হইলেন। দেবদূত ইত্যগ্রেই অদৃশ্য হইয়াছিলেন। মনসুর উন্মত্ত! সেই অবস্থায় "আনাল্ হক্" উচ্চারণ করিতে করিতে প্রত্যূষসময়ে জনাকীর্ণ মহানগর বোগদাদে প্রবিষ্ট হইলেন।*

এক্ষণে একটী কথা। মহর্ষি মনসুরের উন্মত্ততার পরিণামফল পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষির ভগিনীর সহিত তাঁহার পরিণাম-ঘটনার দুই একটী বিষয়ের সংশ্রব আছে। কিন্তু তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করার আবশ্যকতা বিবেচিত হয় নাই। ফলতঃ সেই ঘটনা যে তদীয় সহৃদয়া সহোদরার মাহাত্ম্যপ্রকাশক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তজ্জন্যই (অপ্রাসঙ্গিক হইলেও) এস্থলে সেই শেষের একটী ঘটনার কথা অগ্রে বলিতে বাধ্য হইলাম।

* এক্ষণে পাঠক! বিবেচনা করুন, ঘটনাটী কি। এই রমণী যে বিশুদ্ধ-চরিত্রা ও ধর্ম্মানুরাগিণী, তাহাতে সংশয় নাই। ইনি নির্জ্জনে যোগ-সাধনো-দ্দেশে এই নিভৃত স্থানে নিত্য আসিতেন, তাহা ত আপনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু এই শুভ্রকান্তি দেবদূত কে? আর তাঁহার হস্তস্থিত পানপাত্রই বা কি? অনেক সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি বলেন, দেবদূত নামে বর্ণিত এই সাধু পুরুষ রমণীর দীক্ষাগুরু, তিনি অতি প্রাচীন ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তদীয় শ্বেতশ্মশ্রু ও শ্বেত কেশরাশিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন সুধা-ধবলিত সৌন্দর্য্যে পর্য্যবেশিত হইয়াছে। আর সেই পাত্র? তাহা তাঁহার অনুতায়মান তত্ত্বজ্ঞান-ভাণ্ডার ব্যতীত কিছুই নহে।

কথিত আছে, মহর্ষির দেহাবসানের অব্যবহিত পরে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়া কহেন, "মনুস্থর এমনি তেজস্বী সাধু পুরুষ ছিলেন যে, আপনি যাহা সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, সহস্র পীড়ন সহিলেন, প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, তথাপি তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেন না।" তাঁহার ভগিনী এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত সদুঃখে বলিয়াছিলেন, "তোমরা নিতান্ত ভ্রান্ত! প্রকৃতই আমার ভ্রাতা যদি পুরুষ হইত, যদি তাহার কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা ও পৌরুষ থাকিত, তাহা হইলে পাত্র লেহন করিয়া কি উন্মত্ত হইয়া যাইত? পূর্ণ পাত্র পানেও তাহার অন্তর অবিচলিত—স্থির—শান্ত থাকিত। আমি তাহাকে পুরুষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।" রমণী ইহা বলিয়া অতঃপর উত্তেজনার বশে বলিয়া ফেলিলেন, "আজ বিংশতি বর্ষ হইতে চলিল, আমি প্রত্যেক রজনীতে এই দৈব প্রেমামৃত পূর্ণ মাত্রায় পান করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কৈ, কখন মুহুর্ত্তের জন্যও ত বিচলিত হই নাই!! আমার রসনা অবাধ্য হইয়া কখন ত অন্যায়াচরণ করে নাই!! বরং আমি নিয়ত নম্রতার সহিত প্রার্থনা করিয়াছি, "হে দয়াময় প্রভো! এতদপেক্ষা অধিকতর উন্নতিমার্গে আমাকে আকর্ষণ করুন।"

প্রিয় পাঠক! দেখুন কি তেজস্বিতা! কি অপূর্ব্ব

নারী-হৃদয়ের বল !! কি অলৌকিক সাধন-সহিষ্ণুতা !!! বলুন দেখি, ইনি কি মানবী ?—না দেবী ? কে না বলিবে ইনি মানবী-আকারে মর্ত্ত্যধামে বরণীয়া দেবী ছিলেন ! ফলতঃ তত্ত্বদর্শী, পরিশুদ্ধ প্রেমোন্মত্ত মহর্ষি মনসুর অপেক্ষাও যে, এই তপস্তেজঃ-শালিনী অমরাঙ্গনার তপশ্চারণ উচ্চতর ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহের লেশ মাত্র নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মনসুরের 'আনাল হক্' উক্তি ধর্ম্মভীরু মুসলমান জনসাধারণের হৃদয়ে যেন সুতীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহারা সাতিশয় উত্ত্যক্ত ও মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। অনেকে নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই মনসুরের মস্তক অসিপ্রহারে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, ইহাই অনেক অসহিষ্ণু অবিবেচক ব্যক্তির অভিপ্রায়। ধর্ম্মযাজকগণ মনসুরের অবৈধ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া বিষম বিরক্তিসহকারে বদনমণ্ডল বিকৃত পূর্ব্বক কর্ণে হস্তার্পণ করিলেন। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতাশালী, ধৈর্য্যশীল, সিদ্ধপুরুষ মনসুর তাহাতেও বিচলিত হইলেন না।

"হায় হায়, মনসুরের কি হইল, আহা, কেন তাঁহার এ কুমতি ঘটিল" এবংবিধ বাক্যে অগণ্য লোক অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। বহু দয়ার্দ্র ব্যক্তি সমবেত হইয়া মনসুরকে সানুনয়ে কহিলেন, "আপনাকে আমাদের একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। আপনি 'আনাল্ হক্' উক্তির পরিবর্ত্তে 'হু অল্ হক্' * বলিতে

* "হু অল্ হক্" অর্থাৎ তিনিই সত্য (ঈশ্বর)

থাকুন। বোধ হয়, আমাদের এই অনুরোধের কারণ আর আপনাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না। আপনি স্বয়ং শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞান-গরীয়ান্; অবশ্যই ইহার গূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।" মহর্ষি এতদ্‌শ্রবণে মৃদুগম্ভীর-ভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ, সমুদয়ই বুঝিতে পারিয়াছি, আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু নহি, অনুপম দাতা ও দয়ালু আল্লার অসীম অনুগ্রহে বুঝিবার শক্তি আমার আছে। সত্য বটে, তিনিই সত্য, তিনিই ঈশ্বর—সমুদয়ই তিনি। তিনি সর্ব্বময়, তিনি বিশ্বব্যাপী, তিনি সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব সময়েই বিদ্যমান ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন।—

নগর ভিতরে, বিজন কান্তারে,
জন-প্রাণী-হীন মরুভূ-মাঝারে,
উচ্চ গিরি-শিরে, নীল সিন্ধু-নীরে,
সুখদ আলোকে, দুখদ তিমিরে,
নরের অগম্য পর্ব্বত-গুহায়,
বজ্রাগ্নি-জড়িত জলদ-মালায়,
আকাশে, পাতালে, অনিলে, অনলে,
সুদূর সুমেরু-কুমেরুমণ্ডলে,
গোলাপীঅধরা উষার ললাটে,
স্তিমিতনয়ন প্রদোষের পাটে,

ফল, ফুল, তরু, লতায়, পাতায়,
ফুলের সৌরভে, ফল-স্বাদুতায়,
অমৃতে গরলে, জলের কল্লোলে,
পাবক-শিখায়, পবন-হিল্লোলে,
সমুজ্জ্বল ছবি রবির প্রভায়,
চাঁদের কিরণে, রম্য তারকায়,
সংহার-মুরতি সমর-প্রাঙ্গণে,
কেলি-লীলা-ভূমি প্রমোদ-কাননে,
সূক্ষ্ম বালুকণে, মানবের মনে,
দীনের কুটীরে, রাজার ভবনে,
তোমাতে, আমাতে, ধনী, বিত্তহীনে,
পতঙ্গ, কীটাণু, পশু-পক্ষী-মীনে,
আরো আছে যত নাম কব কত ?
সব তাতে তাঁর বিরাজ সতত ! !

আহা ! তিনি সকল স্থানেই সকল সময়েই সমভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! আমি তোমাদের কথায় বুঝিতেছি, তিনি যেন কোন্ সুদূর অপরিজ্ঞাত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। আমরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তবুও তাঁহার দর্শন মিলিতেছে না, সে হারান ধনের— সে অমূল্য রত্নের উদ্দেশ পাইতেছি না। এ কি অদ্ভুত

কথা তোমাদের! কি অযৌক্তিক প্রলাপ-বচন! কি ভয়ানক ভ্রান্তি!! চক্ষুষ্মান্ বিবেকী ব্যক্তি কখন কি একথা বলিতে সাহস করে? ভ্রাতৃগণ! তিনি কি হারাইবার সামগ্রী? ঐ দেখ দেখ, যদি নয়ন থাকে, তবে উন্মীলন করিয়া দেখ, অপরূপ বিরাটরূপে নয়ন-মন বিমোহিত করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকেই বিরাজিত রহিয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদির আধার অনন্ত আকাশ কি ক্ষুদ্র নয়নের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে পারে? বিস্তীর্ণ মহাবারিধির লয় নাই, তাহা চিরদিনই সমভাবে বর্ত্তমান। বরং ক্ষুদ্র আমি—সামান্য জলবুদ্বুদমাত্র, তন্মধ্যে পড়িয়া কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছি। আমার চিহ্ন বা সত্তার লেশমাত্র নাই। হায়, আমার আমিত্ব কোথায়?” ইহা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন। তখন অনুরোধকারী ব্যক্তিগণের মনে আরও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাঁহারা ইহার প্রতীকার-প্রত্যাশায় উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইস্‌লামের প্রকাশ্য-ক্রিয়াশীল সেই ব্যক্তিবৃন্দ, ধর্ম্মোপদেষ্টা শাস্ত্রবিৎদিগের নিকটে যাইয়া এই ব্যাপার জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা তৎশ্রবণে সাতিশয় চমকিত হইয়া নানা প্রকার বাদানুবাদ ও অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তত্ত্বদর্শী সুধীগণ নিস্তব্ধ—নীরব! তাঁহারা মন্সুরের আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং তাঁহার

উক্তির গূঢ়ার্থ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তজ্জন্য তদ্বিরুদ্ধে বাক্যমাত্র ব্যয় করাও অন্যায় বোধে সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের সেই মৌনাবলম্বন হেতু আবার জন-সাধারণে মনৃসুরকে প্রকৃত ধর্ম্মবিরোধী বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। অনন্তর কি সাধারণ জনগণ, কি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী, সকলেই মনৃসুরের সেই মহাপরাধের দণ্ড প্রদানের জন্য সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধান ও মহামান্য খলিফার অনুজ্ঞা ব্যতীত তাহা সংসাধিত হইবার যো নাই। ইহা ভাবিয়া সকলে প্রথমতঃ মুফ্‌তীর (ফতোয়া-দাতার) অভিমতপ্রার্থী হইলেন। তৎকালে আবুল আব্বাস্ নামক জনৈক শাস্ত্রজ্ঞান-গরীয়ান প্রতিভাবান্ পুরুষ বোগ্‌দাদের মুফ্-তীর পদে বিরাজিত ছিলেন। তিনি সমাগত ব্যক্তি-বর্গের প্রশ্ন শ্রবণে প্রথমে নিরুত্তর হইলেন, তৎপরে পুনঃ প্রশ্নে মলিনমুখে কহিলেন, "মনৃসুরের প্রকৃত চরিত্র আমার জ্ঞানাতীত, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন অভিমত ব্যক্ত করিতে অক্ষম।" ইহা শুনিয়া সকলে হতাশ-মলিন মুখে আসিয়া উজিরের শরণাপন্ন হইলেন।

খলিফার উজির হামেদ এব্‌নে আল্ আব্বাস্ ধর্ম্ম-ভীরু ও অতি সরলচেতা ব্যক্তি ছিলেন। সমাগত জনমণ্ডলী মর্ম্মাহত হইয়া মনসুরের ধর্ম্মবিগর্হিত উক্তি

ও তজ্জনিত অনিষ্টের কথা করুণকণ্ঠে বিবৃত করিলে তিনি আকুল উত্তেজনার সহিত মহর্ষির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং কহিলেন, "পবিত্র ইসলামকে অক্ষুণ্নরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইলে ঈদৃশ ধর্ম্মদ্রোহীর শিরশ্ছেদন করাই কর্ত্তব্য।" অনন্তর ধর্ম্মাচার্য্যগণ সেই ধর্ম্মোন্মত্তের বিরুদ্ধে পৃথকভাবে ফতোয়া দিতে অসম্মত, ইহা বুঝিয়া তিনি একটী সভা আহ্বান করিলেন। সভায় সাধারণ জনগণ এবং বোগদাদের যাবতীয় ধর্ম্মাচার্য্য সমবেত হইলেন, মনসুরও আসিলেন। তাঁহার সহিত ঘোর তর্ক—অশেষ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বী মনসুর কোনক্রমেই স্বীয় পথভ্রষ্ট হইবার পাত্র নহেন, তিনি আপন উক্তির প্রত্যাহার করিলেন না। তখন উজির ও সভাস্থ ব্যক্তিগণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; ফতোয়া লিখিতে আদেশ হইল। বোগদাদ-ধর্ম্মাধিকরণের মহামান্য বিচারপতি কাজী এবনে ওমর কর্ত্তৃক মহর্ষির প্রাণদণ্ডের বিধি লিপিবদ্ধ হইল। অন্য ধর্ম্মাচার্য্যেরা তাহা অনুমোদন ও স্বাক্ষর করিলেন। এই সময়ে মহর্ষি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "কাহার আজ্ঞায় কোন্ বিচারে আপনাদের এ অনধিকার চর্চ্চা? অথবা তাহা না হইলেও ছলনা করিয়া দোষ গ্রহণ কোন্ শাস্ত্রের বিধি? জানিবেন, আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান

শরা-সঙ্গত।* আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস পবিত্র ইস্‌লামের পবিত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। খোদার রচিত রম্য মন্দির চূর্ণ করে কাহার সাধ্য? সর্ব্বব্যাপী শক্তি-মান খোদা সর্ব্বত্রই স্বীয় রক্ষণশীল হস্ত বিস্তার করিয়া আছেন।”

মহর্ষির এবংবিধ অনর্গল বাক্য পরম্পরায় উজির অতিশয় রুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন এবং মনসুরকে কারা-রুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া ব্যবস্থালিপিখানি অবিলম্বে ধর্ম্ম-পরিরক্ষক মহামান্য খলিফার দরবারে উপস্থিত করিলেন। অনেক অসহিষ্ণু লোকও দরবারে গমন করিল।

তৎকালে মনস্বী আল্ মোক্‌তাদীর বিল্লাহ্ মহামান্য খলিফার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। তিনি এক জন কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। পবিত্র ‘শরিয়ত’ * বহির্ভূত কোনও কার্য্য দেখিলে তিনি কাহাকেও মার্জ্জনা করিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধরিয়া বিচার পূর্ব্বক দোষীর দণ্ডবিধান ও নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করিতেন। তিনি মনসুরের

* শরিয়ত বা শরা—ইস্‌লামী ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ কোরাণ শরিফ, হাদিস্ শরিফ, এজ্‌মা এবং কেয়াস্।

অধর্ম্মোক্তির বিষয় অবগত হইয়া প্রথমতঃ 'পাপ পাপ' বলিয়া ম্লানমুখে কর্ণকুহরে হস্তার্পণ করিলেন। পরে অধোবদনে নীরব হইয়া কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন—কাহাকেও কিছু বলিলেন না। এইরূপে বহু ক্ষণ অতীত হইল দেখিয়া আগন্তুকগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মোস্‌লেম-সমাজ পতে! আপনাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আমরা ভীত ও বিচলিত হইয়াছি। শাস্ত্রানুমোদিত শুভ কার্য্য পরিপালনার্থ পাপ-প্রতীকারে নিশ্চেষ্ট থাকার কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারি না! যদি পবিত্র 'শরিয়ত' অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, যদি ধর্ম্মাবমাননার প্রতিবিধান করিতে চান, দুষ্টের দমন যদি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন। আপনি ধর্ম্মের রক্ষক এবং আমাদের প্রতিপালক, আপনি বৈধ ব্যাপারে শৈথিল্য বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে নির্ম্মল ইসলাম-ধর্ম্মে কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষিপ্ত হইবে, একেশ্বরবাদের গৌরবোন্নত মস্তক এবং আমাদের উজ্জ্বল মুখ এই নিদারুণ ধর্ম্মাবমাননায় নিষ্প্রভ হইবে। ক্ষুদ্র আমরা, ইহা ব্যতীত আপনাকে আমাদের আর কি অধিক বলিবার ক্ষমতা আছে প্রভো?"

প্রজারঞ্জক খলিফা নীরবে সমস্তই শুনিলেন। বুঝিলেন, তাঁহাদের মর্ম্মে কি অসহনীয় ভীষণ আঘাতই লাগিয়াছে। পরন্তু সাধারণের অভিপ্রায় এবং মনসুরের পরিণাম, এই উভয় দিক্ ভাবিয়া সেই আঘাতের প্রতি-ঘাত তিনি আপনিও অনুভব করিলেন। তাই তিনি স্থির-ধীর-নীরব-গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। কিন্তু কি করিবেন? অবশেষে অনেক চিন্তার পর, এই প্রকাশ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে মনসুরকে কারাগারে বন্দীভাবে রাখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

এদিকে সত্যাকৃষ্ট মনসুর যখন রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল। জনসঙ্ঘ মহর্ষির অগ্রপশ্চাৎ কি যেন এক মহোৎসবে মত্ত হইয়া ছুটিল। তপোধন অবিলম্বে ভীষণ কারাভবনের দ্বারদেশে নীত হইলেন। নির্দ্দয় রাজ-কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে কারারক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিল—ভক্ত মনসুর বন্দী হইলেন। আহা কি আক্ষেপ! কি ঘোর যাতনা!! জনসঙ্ঘ আবার তখনই কোলাহল করিতে করিতে ফিরিল; বোগ্দাদের ঘরে ঘরে আনন্দ-স্রোত বহিল, আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে এই কথাই চলিল। মনসুরের দুঃখে কেহ হৃষ্ট, কেহ

রুষ্ট, কেহ বা সমবেদনায় নীরবে অশ্রুমোচনে নিরত হইল।

জনৈক গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, যখন মহর্ষি ধৃত ও প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া কারা-দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি অবজ্ঞার সহিত উপহাস করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মনসুরকে কহে, "ওহে সাধু! তুমি যদি সাধনার বলে প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ হইয়া থাক, তবে আজ তোমার এ ভয়ানক দুর্গতি দেখিতেছি কেন? তোমার সেই তপোবল কি এই সামান্য সৈন্যবলের নিকট পরাভূত হইল? দুর্দ্দান্ত শার্দ্দুল-সংগ্রামে ভীরুপ্রকৃতি অজের জয়! এ অতি আশ্চর্য্য ও বিড়ম্বনা দেখিতেছি। হায় ভণ্ড যোগি! যদি তুমি বাস্তবিকই সাধক হইতে, যদি তোমার অণু-মাত্রও সাধনার বল থাকিত, তাহা হইলে শত সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া আজ এই কষ্টকর বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষণে সমর্থ হইতে। অহো! যে অদূরদর্শী ব্যক্তি ছলনার ছদ্মবেশে দেহাবৃত ও ধর্ম্মের ভাণ করিয়া অধর্ম্মের সঞ্চয় করে এবং তদ্ধেতু পরিশেষে আপনি ঘোর বিপদে পতিত হয়, এ জগতে তাহার অপেক্ষা অধিক অর্ব্বাচীন ব্যক্তি কে আছে?"

মহর্ষির কর্ণকুহরে এই বিদ্রূপসূচক কটূক্তি সুতীক্ষ্ণ

শেলের ন্যায় প্রবেশ করিল। মূর্খের কর্কশ বাক্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করা অনুচিত জানিলেও, তিনি কেবল তাহাকে অপ্রতিভ করণার্থ তাহার বিদ্রূপ-উক্তি শ্রবণ-মাত্র তন্মুহূর্ত্তে সেই সশস্ত্র রাজপ্রহরীবেষ্টিত ও নাগরিক-গণের জনতার মধ্যস্থলে থাকিয়া, শত-সহস্র সতর্ক নেত্রে ধাঁদা লাগাইয়া, সহসা যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন, তাহা কেহ অনুভব করিতেও পারিল না। তখন রাজকিঙ্করগণ ও জনসাধারণ সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত, বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে পরস্পরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মুখে শব্দ নাই, নয়নে পলক নাই, হৃদয়ে শোণিত অচল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পন্দন-রহিত,—শক্তিশূন্য—স্থির। নাট্য-শালার পট-পরিবর্ত্তনের ন্যায় সহসা কি যেন এক ঐন্দ্র-জালিক অপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। ভাবিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। কূটবুদ্ধি প্রহরিগণও এ ব্যাপারে ম্রিয়মাণ—সংজ্ঞাহারা। পরে তাহাদের কথ-ঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে, "হায় কি হইল, কোথায় গেল, কোথায় গেলে মনসুরকে পাইব, খলিফা শুনিলে কি বলিবেন, তাঁহার সম্মুখে কি উত্তর করিব, হায়; না জানি কি কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে, এত লোকের হস্ত হইতে পলায়ন! ছি ছি! কি লজ্জার কথা, কি অপ-

মানের বিষয়, কি করিয়া রাজদরবারে এ পোড়া মুখ দেখাইব? দেশদেশান্তরের লোক এ কথা শুনিলেই বা কি বলিবে! হায় হায়, এমন বিপদে কখন ত কেহ পড়ে নাই!" ইত্যাকার অনুতাপ-বাক্যে মহা হুলস্থুল বাধাইয়া দিল। কেহ কিঞ্চিৎ মৌখিক সাহস দেখাইয়া কহিল, "ওরে ভাই! ভাবিয়া কি হইবে; আর ভয়ই বা কিসের? আমরা ত আর সাধ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই নাই! সে যে একটা ভয়ানক মায়াবী, তাহা সকলেই জানিয়াছে! মায়াবিদ্যার বলে যাহার অদৃশ্য হইবার শক্তি আছে, তাহাকে আমরা কেন? জগতের যাবতীয় রাজশক্তি একত্র হইলেও শাসনে রাখিতে পারে কি না সন্দেহ। অতএব সকলে চল, খলিফার হুজুরে গিয়া একথা জানাইগে। আর তিনিই কি ইহা অবগত নহেন?" অনেকের কিন্তু এই সাহসের বাক্যে মন আকৃষ্ট হইল না; তাহারা হতাশমলিন মুখে মস্তকে হাত দিয়া অবশাঙ্গে বসিয়া পড়িল, খুঁজিয়া কূল-কিনারা পাইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্দী পলায়ন করিয়াছেন। প্রহরিগণ ব্যস্ততার সহিত দিগে দিগে অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, নগরময় মহা আন্দোলন-কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু কিরূপে কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যাহাদের তত্ত্বাবধানে বন্দী যাইতেছিলেন, তাহারাও 'এই ছিল,—এই নাই' ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারে না। আপন আপন বুদ্ধির প্রাখর্য্যানুসারে কত জন কত কথার অবতারণা করিতেছে, কত কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। এদিকে সাধকশ্রেষ্ঠ মনসুর দৈব শক্তি প্রভাবে অদৃশ্য হইয়া স্ব-ভবনে আসিয়া উপস্থিত। তিনি পূর্ব্ব নিয়মানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া নিরাপদে নিরুদ্বেগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধিৎসু জনগণ কেহই তাঁহার দর্শন পাইত না। কিন্তু তিনি কখন কখন কোন কোন ব্যক্তির প্রতি সদয় হইয়া সাক্ষাৎ করিতেন ও তাহাকে প্রীতিসম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সময়ে দর্শনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যে বস্তু তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতেন, তিনি তাহাই পাইতেন। সে

বস্তু দুষ্প্রাপ্যই হউক, আর সুলভ-লভ্যই হউক, তপোধন প্রার্থনামাত্র হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক 'এই ধর' বলিয়া তপোবলে সেই সেই দ্রব্য প্রদানে যাচকের সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন, তাহাতে অণুমাত্র বিলম্ব বা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতেন না। আবার কখন তিনি লোক-লোচনের গোচরে আসিয়া স্বেচ্ছায় ধৃত হইয়া কারাগৃহে নীত হইতেন; কিন্তু আবার পরক্ষণেই যোগবলে তথা হইতে অদৃশ্য হইয়া নিজ নিকেতনে প্রস্থান করিতেন। এইরূপে তিনি ঐন্দ্রজালিকের মায়াবিদ্যার ন্যায় নানা অত্যদ্ভুত কার্য্য দ্বারা সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিতে লাগিলেন। সাধারণে তাঁহার এই প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়াও ঈর্ষাবশতঃ অপযশঃ ব্যতীত তাঁহার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিল না। এই অবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। মনসুরের সম্বন্ধে আপামর সাধারণের মধ্যে নিত্য নূতন নূতন বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খেরা মনসুর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে আছেন, ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস করিল। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাতে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন।

একদা মহর্ষি বন্দী অবস্থায় কারাবাসে উপনীত হইয়া দেখেন, অসংখ্য বন্দী সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তদ্দর্শনে তাঁহার কোমল

অন্তরে আঘাত লাগিল। তিনি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদের সেই ভীষণ কষ্টের উপশম জন্য চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে দিবা গতে রাত্রি উপস্থিত হইলে, তিনি প্রত্যেকের কারাবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্দীবৃন্দ আপন আপন দুর্দ্দশার পূর্ব্ব ঘটনা বর্ণনা করিলে পর তপস্বীপ্রবর কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ! আমি তোমাদিগকে এই মুহূর্ত্তেই এই অসহ্য কারাযন্ত্রণা হইতে মুক্তিপ্রদান করিতেছি। তোমরা আমার কথা শুন, এই নরকতুল্য অগম্য স্থান হইতে আপন আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান কর, ইহাতে আর কালবিলম্ব করিও না।" তখন বন্দিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরস্বরে কহিল, "মহাত্মন! আমাদের কি এমন সৌভাগ্য হইবে? আমরা কি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখ দেখিয়া ইহ-জীবনে আবার আনন্দলাভ করিতে পারিব? আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি যে নিশার স্বপ্নবৎ অলীক। এই দেখুন, আমাদের হস্ত-পদ লৌহ-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, পার্শ্বপরিবর্ত্তন করি বা এক পদ অগ্রসর হই, আমাদের এরূপ সামর্থ্য নাই। সুতরাং ইহজীবনে আমাদের আর পরিত্রাণের আশা কোথায় আছে, বলুন দেখি? অহো! সে আশা সুদূরপরাহত। তবে যদি আপনার আশীর্ব্বাদে এই মন্দভাগ্যদের প্রতি দৈব কখন অনুকূল হন, তাহা

হইলে একথা এক দিন সম্ভব হইলেও হইতে পারে। নতুবা আকাশের চন্দ্র-ধারণের ন্যায়, পঙ্গুর পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের ন্যায় নিষ্ফল কল্পনা করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে আরও যন্ত্রণাদায়ক ও বিপজ্জনক বলিয়া জানিবেন।”

বন্দীদিগের এই কাতরোক্তি শুনিয়া দয়া-প্রবণ-হৃদয় মনসুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনি তাহাদের উদ্দেশে ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধদিকে হস্তোত্তোলন করিয়া সজোরে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। আহা কি আশ্চর্য্য তপোবল! কি অপার্থিব ঈশ্বরানুরক্তি!! মহর্ষির পবিত্র হস্ত নিম্নমুখে যেই আকৃষ্ট হইল, অমনি কয়েদী-দিগের হস্তপদ-নিবদ্ধ শৃঙ্খলনিচয় খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ঝন্‌ঝনায়মান শব্দ করত ভূতলে নিপতিত হইল। বন্দিগণ হস্ত-পদের বন্ধন-বিমুক্ত ও নরক-যন্ত্রণার অব-সান হইল দেখিয়া, সোৎসাহে উঠিয়া মহর্ষির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং সহর্ষে যুক্তকরে কহিল, “মহাভাগ! করুণাময় জগৎপাতার ইচ্ছায় এবং আপনার ঐকান্তিক যত্ন ও আশীর্ব্বাদে সংপ্রতি আমরা বন্ধন-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি-লাভ করিলাম বটে, কিন্তু বলুন, কি উপায়ে এই ঘোর অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভীষণ পুরী হইতে প্রস্থান করি? অত্যুচ্চ নগরাজ সদৃশ দুর্ভেদ্য

উন্নত প্রাচীরে কারাগার পরিবেষ্টিত, যমদূতাকৃতি অসংখ্য ভীষণদর্শন সশস্ত্র প্রহরী দিবারজনী তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, লৌহ-বিনির্ম্মিত অতি দৃঢ় কবাট কঠিন কুলিশোপম তালাসমূহে আবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত আরও বহুবিধ অন্তরায় রহিয়াছে। পিপীলিকা প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ পথও এখানে নাই, তবে বলুন ত, আপনার এ মন্দভাগ্য ভৃত্যগণের কি এমন দৈব-শক্তি আছে যে, তৎপ্রভাবে তাহারা নিরাপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিতে পারে?" এই খেদোক্তি শ্রবণে তাপসপ্রবর স্বীয় গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া এবং তর্জ্জনী ঊর্দ্ধে উঠাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চতুঃপার্শ্বে নেত্রপাত করিলেন। তাহাতে মহর্ষির দৈবশক্তি-বলে কারাবাসের চতুর্দ্দিকস্থ বিশাল ভিত্তিতে মানবদেহ-প্রবেশোপযোগী বহু গবাক্ষের সৃষ্টি হইল। * তদ্দর্শনে

* বর্ত্তমানের নব্য সমাজ এরূপ ঘটনা বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারেন বটে, কিন্তু অবিশ্বাস করিবারও কোন কারণ নাই। মনুষ্য যোগবলে—সাধন-শক্তিতে অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কি না করিতে পারেন? অমুক সাধু দীর্ঘকাল মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত ছিলেন, অমুক সন্ন্যাসী শূন্যপথে প্রয়াণ ও নদীর উপর দিয়া গমন করিয়াছিলেন, এ সকল একেবারে ভিত্তিশূন্য কথা নহে। পৃথিবীর সর্ব্ব জাতীয়ের সাহিত্য-ইতিহাসে এবংবিধ ঘটনার উল্লেখ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক দিনের কথা নহে, রাজা রণজিৎ সিংহ এক জন সন্ন্যাসীকে মৃত্তিকা মধ্যে ৪০ দিন প্রোথিত রাখিয়া তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পাঠকগণ সেই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ঘটনার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন।

বন্দিগণের হৃদয় বিস্ময়-রসে আপ্লুত, সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইল—ভাবিয়া আকাশ পাতাল কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অতঃপর তাহারা তপস্বীর ইঙ্গিত-ক্রমে সেই সদ্যসৃষ্ট গবাক্ষদ্বার দিয়া অলক্ষ্যে বহির্গত হইয়া পড়িল, প্রহরিগণ তাহা অণুমাত্রও অনুভব করিতে সমর্থ হইল না।

পর দিবস নিশাবসানে কারারক্ষকগণ বন্দীদিগের তত্ত্ব লইতে গিয়া দেখে বন্দীশালায় একটীও বন্দী নাই। তখন সকলেই চমকিত, চিন্তিত ও ভয়াকুল হইল। ক্রমে এই বিস্ময়জনক ঘটনা রাজপুরুষগণের কর্ণে উঠিল। কারাধ্যক্ষ অবিলম্বে কারাগার পরিদর্শনে আসিলেন, দেখিলেন কারাগৃহ নিস্তব্ধ—নীরব; কারা-বাসীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল দেখিতে পাইলেন, মহাযোগী হোসেন মনসুর ধ্যানস্তিমিতনেত্রে গম্ভীরভাবে এক প্রান্তে একাকী উপবিষ্ট আছেন। এতদ্ব্যতীত কারা-প্রাচীরে অসংখ্য গবাক্ষ-দ্বার দৃষ্টি করিলেন। এই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে কারাধ্যক্ষ নিরতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। যুগপৎ হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময় ও ভয় তাঁহার অন্তরাত্মাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল,—সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। ক্ষণেক স্থিরদৃষ্টে এক দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিলেন। আহা, কি

অলৌকিক ক্ষমতা! কি অমানুষিক চমৎকার কার্য্য !! এই অশ্রুত ও অভূতপূর্ব্ব অপার্থিব ব্যাপার তপস্বীকুল-শিরোভূষণ মহাত্মা মনসুর কর্ত্তৃক সমাহিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চিত জানিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিস্ময়সহ ভক্তির উদ্রেক হইল। আবার এক জন মহামনা সাধুপুরুষকে পাপপঙ্কিল নিকৃষ্টচরিত্র দুর্জ্জনদিগের সহিত একত্রে কারাবদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং পরিণামে তন্নিমিত্ত ভক্ত-বৎসল বিশ্বপাতার সমীপে না জানি কত অপরাধী ও দণ্ডার্হ হইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া নিমেষমধ্যে গাঢ়-কৃষ্ণ বিষাদবারিদের সঞ্চারে তদীয় নির্ম্মল চিত্তাকাশ মলিন মূর্ত্তি ধারণ করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ অপলকনেত্রে ললাট কুঞ্চিত করিয়া বিরসবদনে নীরব রহিলেন।

অতঃপর নিরীহ কারাধ্যক্ষ মৃদুপদে মহর্ষির নিকট-বর্ত্তী হইয়া অবনতমস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক হস্তপদে চুম্বন প্রদান ও যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বিনয়নম্রবচনে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন, "মহাভাগ! আমরা রাজাজ্ঞানুসারে আপনার প্রতি যাদৃশ উৎপীড়ন করিয়াছি, তাহাতে আপনার সম্মুখে পুনর্ব্বার বাক্যস্ফুরণ করিতে সাহস হয় না। তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে—আত্মরক্ষার জন্য ব্যাকুলভাবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে অগ্রসর

হইতেছি। এ দীন রাজকিঙ্কর, এই বন্দীশালার তত্ত্বাবধানকার্য্য এই দীনের উপরে ন্যস্ত আছে। বন্দী-সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও গোলযোগ বা বিশৃঙ্খলা ঘটিলে আমাকে বিপন্ন হইতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ ঘোর সঙ্কট উপস্থিত, তাহাতে আমার জীবন সংশয় নিশ্চিত ভাবিয়া আমি আকুল ও আত্মহারা হইয়াছি। সাধু-প্রবর! কেবল আপনার এই দীন হীন দাসের তুচ্ছ জীবন গেলে দুঃখ ছিল না, বরং তাহাতে পাপী-তাপী যে আমি, আমি আপনাকে সুখী ও কৃতার্থ বোধ করিতাম। কেননা এক জন সৎকর্ম্মশীল পবিত্র পুরুষের কৃত কার্য্য, যদি অন্য হীন জনের জীবন নাশের কারণ হয়, তবে তাহা কম সৌভাগ্য ও পুণ্যের কথা নহে। কিন্তু যেরূপ সর্ব্বনাশকর মহান অনর্থ আজ সংঘটিত হইয়াছে, তাহাতে আমি বুঝিতেছি,—আমার নিজের, আমার অধীন কর্ম্মচারিগণের এবং আমার পুত্রকলত্রাদির পর্য্যন্ত প্রাণনাশের সম্ভাবনা। তাই আমি ভীতচিত্তে এবং বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—এই যে শমনপুরী সদৃশ প্রহরী-বেষ্টিত ভীষণ কারা-ভবন, যাহার নাম শ্রবণে জগৎ আতঙ্কিত হইয়া থাকে, যাহাতে ক্ষুদ্রকায় পীপিলিকারও প্রবেশ বা নিষ্ক্রমণের পথ নাই, বিশ্বব্যাপী সমীরণ এবং রবিরশ্মিও যেখানে সঞ্চরণ করিতে কুণ্ঠিত

হয়, সেহেন কঠিন স্থান হইতে অপরাধীবৃন্দ কিরূপে কখন কোথায় পলায়ন করিল? অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বলিয়া এ দীন দাসের উদ্বিগ্ন চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন।”

তেজস্বী তাপস কারাধ্যক্ষের বাক্য শ্রবণে গম্ভীর-ভাবে কহিলেন, “জানিও, বিধাতার অনুগ্রহ হইলে পার্থিব নিগ্রহের অবসান হইয়া থাকে। বন্দীরা আজ বিধাতার অনুগ্রহেই মুক্তিলাভ করিয়াছে”। মহর্ষি ইহা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন কারাধ্যক্ষ কহি-লেন, “তবে আপনি আর এস্থলে বসিয়া নিরর্থক কষ্ট-ভোগ করিতেছেন কেন? আপনি ত সর্ব্বাগ্রে এই কুস্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারিতেন? আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনিও স্বভবনে প্রত্যাগমন করুন। নিয়তিলিপি খণ্ডনীয় নহে, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে। রাজপুরুষগণ এই অত্যদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে—আমার উপর উৎপীড়ন হইলে, আমি যদৃচ্ছা উত্তর প্রদান করিব।”

কারাধ্যক্ষের কাতরোক্তি শ্রবণে মহর্ষি কহিলেন, কারাবাসিগণ খলিফার বন্দী,—অল্প দোষী, তাই তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে। আর আমি আল্লার বন্দী—ভীষণ অপরাধী, আমার মুক্তি নাই। আমি কোথায় যাইব? যে

ব্যক্তি আল্লার কোপদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, ইহজগতে তাহার কি পলাইবার স্থান বা উপায় আছে? অথবা পলাইলেও কি তাহার রক্ষা হইতে পারে? আমার দেহতরী বিস্তীর্ণ অম্বুনিধি-বক্ষ-ভাসমান অসহায় তৃণখণ্ডের ন্যায় অনন্ত পাথারে ভাসাইয়া দিয়াছি। অনন্ত—অপার—অসীম বারিরাশি আমার চতুর্দ্দিকে বিশাল মরুস্থলীর ন্যায় ধূ-ধূ ধূ-ধূ করিতেছে, উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে নিমেষে শতবার নিমজ্জিত এবং শতবার উত্থিত হইতেছি; আমার সৈকতভূমি-সংলগ্ন হইবার আশা সুদূর-পরাহত। আমি দিশাহারা হইয়া কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সুতরাং এখান হইতে যাইব কোথায়? যাইতে আমার প্রবৃত্তি নাই। রাজদণ্ডে আর ভয় করিয়া কি করিব? আমি হৃদয় দৃঢ় করিয়াছি। আমার দৈহিক পরমাণু পরমাণ্বন্তরে যাইয়া বিলয়প্রাপ্ত হউক, 'মনসুর' এ হেয় এ অকিঞ্চিৎকর নাম পৃথিবী হইতে মুছিয়া যাউক, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ বা অনুতাপ নাই। আহা, মৃত্যুকে ত আমি কুশলকামী পরম বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করি,—তীক্ষাগ্র শূলাস্ত্র ত আমার সুখস্থান-প্রবেশের সুখময় প্রশস্ত সোপান! আহা, কবে সে সুখ-সোপানে আরোহণ করিব? কবে সে আনন্দের দিন আসিবে। কিন্তু সুখের দিন সহজে আসিতে চায় না, সুখ সহজে ঘটে না,

ইহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। কারাপতে! তুমি এখন যাও, এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। আমার প্রিয় কার্য্যের—আমার প্রিয় জনের কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইও না; আমি এখানে থাকিতে অসন্তুষ্ট নহি।”

বুদ্ধিমান্ জেলপরিরক্ষক মনুস্যুরের সারগর্ভ বাক্যের গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎক্ষণাৎ কারাগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন মহর্ষি নির্জ্জনে উপযুক্ত সময় পাইয়া একাগ্রচিত্তে যথারীতি ‘অজু’ অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি-সঙ্গত হস্ত-পদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক অঙ্গশুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পরে কায়মনোবাক্যে পরম করুণাময় নিখিল-নাথের উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া নামাজে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার ভক্তির উৎস উচ্ছ্বাসিত হইল। তিনি পবিত্র ঐশিক প্রেমে বিভোর হইয়া একেবারে স্পন্দন-শক্তিরহিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উপাসনা সাঙ্গ হইলে তন্ময়চিত্তে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া গদ-গদকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন,—“জগৎপতে! হে মহিমময় ভুবন-পালক! হে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী অনাদি পুরুষ! তোমার অপার অনন্ত কৃপা-পারাবারের বিন্দু-বারি-বিতরণে আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কর। তুমিই একমাত্র দয়া-ময় দাতা, তোমার দান অতুলনীয়। তুমিই এই অখিল সংসারে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে দয়ার্দ্র—পূর্ণ প্রেমময়, তুমিই

বিশ্বরাজ্যের একমাত্র রাজরাজেশ্বর সার্ব্বভৌম সম্রাট। তোমার রাজ্যে—তোমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, এমন কেহই কোন কালে বিদ্যমান ছিলনা ও নাই; তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, উচ্চ-নীচ, সৎ-অসৎ, দরিদ্র-ধনবান, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই অন্তরের ভাব তুমি অবগত আছ; তোমার সকাশে সকলই বিশদ ব্যক্ত,—অণুমাত্র লুক্কায়িত নাই। জগৎ, জগতীস্থ স্থাবর-জঙ্গম পদার্থনিচয়, স্বর্গ-নরক তোমারই সৃষ্ট। তুমিই নিঃসন্দেহ সর্ব্বনিয়ন্তা, স্রষ্টা এবং পাতা। তোমার চিরস্থায়ী চিরকল্যাণপ্রদ সুন্দর নিয়মে, তোমার অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি পরিশোভিত এই ভূমণ্ডলের যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য তোমার চিরন্তন প্রভুত্বশক্তি! কি সুদৃঢ় শাসন-বন্ধন!! তোমার আজ্ঞা ব্যতীত ক্ষুদ্র একটী তৃণখণ্ডেরও হেলিবার দুলিবার সাধ্য নাই। প্রেমময়! তুমিই আমাকে উন্মত্ত করিয়াছ। আমি তোমারই প্রেমে উন্মত্ত! প্রেমিকের অশান্ত প্রাণের প্রফুল্লতা দিতে তুমিই ত সমর্থ। তুমি দয়াময়—শান্তিদাতা—স্নেহ-প্রবণ-হৃদয়। ব্যথিতের যন্ত্রণা বুঝিতে, পীড়িতের রোগ-প্রতীকার করিতে, তুমি বিনা আর কে আছে? আমি পীড়িত—অশান্ত, তোমার সম্মিলনের অমোঘ ঔষধ প্রদানে আমার চিরাকাঙ্ক্ষা চরি-

তার্থ কর! তোমার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণায় আমি ম্রিয়মাণ,—আমার হৃদয় জর্জ্জরিত, প্রাণ অবসন্ন। আর বিলম্ব সহ্য হয় না; আশা পূর্ণ কর প্রভো! অহো! এ পাপনয়নে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি; মনঃপ্রাণ দুর্ব্বিষহ যাতনায় হু হু করিয়া জ্বলিতেছে, হৃদয়ে কে যেন ঘোর বিষবাণ নিয়ত বিদ্ধ করিতেছে। প্রভো! আমার কিরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে, তোমার ত তাহা অবিদিত নাই। তুমি ত সমস্তই দেখিতেছ জীবননাথ! দেখ, আজ তোমার দাস কিনা উন্মত্ত—পাগল। মন্‌সুর পাগল! তাই কারাগৃহে বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছে। কিন্তু সখে! পরম সুখে আছি। সুগন্ধামোদিত কুসুমোদ্যান অথবা বিবিধ চিত্তচমৎকারী বিলাস-সাধন-সজ্জায় সজ্জিত তুষারধবল প্রাসাদ, ইহার তুলনায় অতি হেয়—অতি তুচ্ছ। কেননা তোমার জন্যই ত আমার ঈদৃশী অবস্থা। ইহা তোমারি নামের মহিমা-দ্যোতক। সখে! আমি তোমারই প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তোমারই সম্মিলনপ্রার্থী। তোমারই বিচ্ছেদানল আমার অন্তরে দিবানিশি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; মিলনের স্নিগ্ধ সুখদ বারিপ্রপাতে শীঘ্র সেই তীব্র অগ্নি নির্ব্বাণ কর। হে প্রাণারাম! আর যে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারি না। তোমার এই দর্শনোন্মত্তের প্রতি সদয় হও, ক্ষুধার্ত্ত পতঙ্গের মিলন-দীপ্তিতে তৃপ্তি সাধন কর—অধমকে

তোমার প্রেমিক বলিয়া গ্রহণ কর। হো হো হো! এ আবার কি? এ আবার কি? এ আবার কি খেলা! মিলন হইতে হইতে আবার নিবৃত্তি! কৌশলি! এ আবার তোমার কি কৌশল? না—আর না। ও খেলা রাখ—তোমার ও আমার মধ্য হইতে পার্থক্যের পর্দ্দা ত্বরায় উঠাইয়া লও, আকাশ-পাতাল এক হইয়া যাউক! আমার আমিত্বটুকু তোমারই। তোমার সঙ্গ লাভ করিয়া তোমার পথে থাকিয়া, তোমার প্রেমে মজিয়া, জগৎ বিরুদ্ধ হয়, হউক,—তোমার প্রদত্ত এ ক্ষুদ্র প্রাণ তোমার নামে উৎসর্গ করিতে—ধূলিময় এ অসার দেহকে শূলাগ্রে সমর্পণ করিতে আমি তিলমাত্র কুণ্ঠিত নহি, বরং সে কার্য্য সমধিক আনন্দের, সমধিক গৌরবের বলিয়া আমি বিবেচনা করি। অতএব হে দীনবন্ধো! হে সন্তাপিতের শান্তিদাতা! হে বাঞ্ছাকল্পতরু! আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।"

তপোধন এবম্প্রকারে উপাসনা সাঙ্গ করিলেন। কথিত আছে, এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রার্থনাকালে করুণ-কাতরে অনুশোচনা করিতে দেখিয়া বিদ্বেষ-বুদ্ধি বশতঃ অবজ্ঞামিশ্রিত বিকৃত স্বরে কহে, "মহাত্মন্! আজ আপনাকে রক্তমাংসময় মরণশীল মানবের ন্যায় কার্য্য করিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছি। বিধাতার অখণ্ডনীয়

লিপি-নিয়মাধীন মন্দমতি মানব আমরা জগৎস্রষ্টার আরাধনা করিতে অবশ্যই বাধ্য। কিন্তু আপনি যখন স্বয়ং 'আনাল্ হক্' বলিয়া ঐশিক দাবী করিতেছেন, তখন বলুন ত, আপনি আবার কোন্ ঈশ্বরের উদ্দেশে মস্তক অবনত করিয়া উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন? যে ব্যক্তি স্বয়ং অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বশক্তিধর অনাদি পুরুষ, তাঁহার কি কখন পুরুষান্তরের স্তবস্তুতির আবশ্যক হয়?—না তাঁহার কেহ উপাস্য থাকিতে পারে?"

উন্মত্ত মন্সুর ইহা শ্রবণে গম্ভীর স্বরে কহিলেন,— "ভদ্র! তোমার এ প্রশ্ন বিবেচনামূলক বটে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া অসূয়াপরিশূন্য হৃদয়ে কহিলে এ প্রশ্ন সমধিক আনন্দবর্দ্ধক ও প্রীতিকর হইত। কিন্তু সে অপরাধ তোমার নহে। মরণধর্ম্মশীল অচিরদেহী অহঙ্কৃত মানবমাত্রই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মোহবশে মূলমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া অঙ্গীকৃত সুব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ফেলে এবং অশুভপ্রদ অপকর্ম্মকে পরম কল্যাণকর কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। ফলে এক্ষণে হৃদয়কে সরল পথে চালাও, আমার বাক্য প্রণিধান কর। আমি নিজেরই উপাসনা—নিজেরই স্তবস্তুতি নিজে করিয়া থাকি। আমার 'নামাজে' আমারই প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। আমি নিজেই উপাস্য,—নিজেই উপাসক, নিজে শিষ্য—

নিজে গুরু, নিজে অনুসন্ধানকারী—নিজেই অনুসন্ধেয় বস্তু, নিজে প্রেমিক—নিজেই প্রেমাস্পদ, নিজে চাক্‌-চিক্যশালী সূক্ষ্ম বালু-কণা,—নিজেই বিরাটবপূ শৈলেন্দ্র, নিজে কিরণকণিকা—নিজেই অননুমেয় প্রকাণ্ড জ্যোতিঃ-পদার্থ, নিজে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতেও বৃহত্তম। আমি স্বয়ং অপার অনন্ত মহাসমুদ্র, আবার স্বয়ং তন্মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র এক জলবিম্ব। অক্ষয় অবিনশ্বর সমুদ্রগর্ভ হইতেই বিম্বের উৎপত্তি এবং তাহাতেই তাহার স্থিতি। সুতরাং সমুদ্র ও জলবিম্বে কি পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে? কখনই নহে। এ উভয় পদার্থ কেহ কখন কাহারও সঙ্গ পরিত্যাগ করে না। একের বিয়োগে, একের অভাবে দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অম্বুবিম্ব ক্ষণভঙ্গুর—অনিত্য, অচিরস্থায়ী; উহা পরিণামে প্রেমভরে ভগ্ন হইয়া সেই মহাসাগরেই বিলীন হইয়া যায়। শেষে যখন সে আপনার অস্তিত্ব লোপ করিয়া সাগরেই মিলিত হইয়া থাকে, তখন আবার ওটী জলধি, এটী তদুৎপন্ন বিম্ব, এরূপ পার্থক্য প্রদর্শন করিবার কারণ কি আছে? মুগ্ধ! চক্ষুর সদ্ব্যবহার কর, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ,—এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় স্থানে, যাবতীয় পদার্থে সেই অচিন্ত্যশক্তি বিশ্ব-প্রকাশক সর্ব্বগুণৈকনিলয় পরম-পুরুষ মহিমা-গৌরবে

সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। প্রত্যেক বস্তুতে তাঁহার সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নিহিত থাকিয়া জগতের আনন্দবিধান করিতেছে। যাহার অন্তর হইতে অন্ধকারাবরণ অন্তরিত হইয়াছে—ব্যবধান তিরোহিত হইয়াছে—জ্ঞানাঞ্জন সহযোগে যাহার নয়ন-পঙ্কজ বিশদভাবে বিকশিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সুস্পষ্টরূপে তদীয় বিশ্ববসুধা-ব্যাপ্ত বিরাট একত্ব দেখিয়া-শুনিয়া তাঁহাকে কোন্ ধারণায় কোন্ মুখে দ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারে? কি প্রকারে তুমি আমি বলিয়া বিভিন্ন ভাবিতে পারে? আহা কি আক্ষেপ।” ইহা বলিয়া আধ্যাত্মিক সাধক মন্সুর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ‘আনাল্ হক্’ ‘আনাল্ হক্’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একদা নিশীথকালে মহামনস্বী হোসেন মনৃস্থর গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয়ান ছিলেন এবং তদবস্থায় স্বপ্নযোগে এক কল্পনাতীত অপূর্ব্ব ঘটনা নয়নগোচর করেন। তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, যেন এক বিস্তীর্ণ শুভ্র ভূমিখণ্ডের উপর একটী প্রকাণ্ড বস্ত্রাবাস স্থাপিত রহিয়াছে। বস্ত্রাবাসটীর শোভাসৌন্দর্য্য অতি মনোরম—বর্ণনাতীত। আহা, শিল্পি-প্রবর তদীয় অত্যাশ্চর্য্য অকৃত্রিম শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় প্রদানার্থ যেন তাহা অপরূপ বিশ্বোজ্জ্বলকারী সুস্নিগ্ধ জ্যোতিরাশি দ্বারা পরম যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বস্ত্রা-বাসটীর চতুর্দ্দিক্ হইতে বিজলীপ্রভাগঞ্জন ঔজ্জ্বল্যলহরী বিনির্গত হইয়া দিগ্‌দিগন্তর আলোকিত ও আমোদিত করিতেছে। বস্ত্রাবাসের অভ্যন্তরস্থ সাজসজ্জাসমূহের সৌন্দর্য্যই বা কত। তৎসমুদয় অত্যদ্ভুত, অলৌকিক ও অপার্থিব। নর-রসনা তাহার বর্ণনা করিতে অশক্ত। মানবের ভাষা সেরূপ ভাবপ্রকাশক শব্দসমষ্টির কাঙ্গাল। নর-চক্ষু সে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার অণুমাত্রও শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ফলতঃ সে সমুদয় সজ্জা মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ও অতুলনীয় বটে, কিন্তু সর্ব্বোপরি সেই বস্ত্রাবাসাভ্য-

স্তরস্থ মৃদু-মন্দ-মলয়-মারুত-শীতলীকৃত ছায়ার গুরুত্ব-গরিমা ও মর্য্যাদা অধিক। কেননা নিদারুণ নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-উত্তাপ-প্রতপ্ত ও ক্লিষ্ট জনগণ সেই সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের শরীরের তাপ ও হৃদয়স্থিত কলুষরাশি বিদূরিত হইয়া যায় এবং সুবিমল সত্বগুণের সঞ্চরণে তাহারা নিঃসন্দেহে ইহ-পারলৌকিক সুখশান্তি ও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে।

বস্ত্রাবাসের মধ্যস্থলে মরকত-মণি-বিখচিত কমনীয় কনকাসনোপরি জগজ্জন-হিতৈষী, মানবের একমাত্র পরিত্রাণপথ-প্রদর্শনকারী মহাপুরুষ হজরত মহাম্মদ মোস্তফা প্রসন্নবদনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট আছেন দেখি-লেন। তাঁহার অলোকসামান্য সৌম্যমূর্ত্তির জ্যোতিতে সর্ব্ব স্থান উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে এবং সেই সুকুমার স্বর্গীয় শরীরের সৌগন্ধে দশদিক্ প্রমোদিত করিয়াছে। হজরতের চতুষ্পার্শ্বে পবিত্র ইস্‌লামের গৌরব-মুকুট স্বরূপ ধর্ম্মপরায়ণ সাধুবৃন্দ ও ধর্ম্মযুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত বীরপুরুষগণ যথাযোগ্য আসনে নতভাবে আসীন রহিয়াছেন। সভার শোভা অতি রমণীয় ও অতুল, যেন সুবিমল নভোমণ্ডলে সংখ্যাতীত কাঞ্চনকান্তি নক্ষত্রের সমাবেশ, মধ্যস্থলে অকলঙ্ক শশধর ভুবনমোহনরূপে বিরাজ করিতেছেন।

সভাস্থল নীরব,—সভাসদ্‌বর্গ নিস্তব্ধ। সহসা বস্ত্রাবাসের এক স্থানে একটী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র পরিলক্ষিত হইল। সেই ছিদ্রপথাভ্যন্তর দিয়া সূর্য্যের কিরণ আপতিত হইতে দেখিয়া সমাগত সাধকবৃন্দের সাতিশয় উৎকণ্ঠার আবির্ভাব হইল। কেননা তদ্দারা তাঁহারা ক্লেশানুভব করিতেছিলেন। তজ্জন্য তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই ছিদ্র রুদ্ধ করণার্থ প্রাণপণশক্তিতে বহু প্রকার চেষ্টা ও কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অশেষবিধ যত্ন ও বহু পরিশ্রম করিয়াও সেই সাধন-বল-গরীয়ান্‌ মুক্তাত্মগণের কেহই সফল-মনোরথ হইতে পারিলেন না। আহা, যে ধর্ম্মপন্থা-চির-বিচরণশীল তত্ত্ববুদ্ধি কৃতী পুরুষগণ দৈবশক্তি প্রসাদে কত কত অসম্ভব ও অদ্ভুত কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন, কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, আজ তাঁহারা এই কার্য্যে অকৃতকার্য্য হইয়া নিতান্ত দুর্ম্মনায়মানভাবে নতশিরে অবস্থান করিয়া রহিলেন। ছিদ্র-পথ কোনমতেই রুদ্ধ হইল না, সকলের সমবেত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া জগদেক-আশ্রয় পুণ্যপুরুষ হজরত মহাম্মদ মোস্তফা সকলকে অতি করুণ-মৃদুস্বরে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"হে ইস্‌লাম-হিত-চিকীর্ষু মহামতিগণ! তোমরা বৃথা চেষ্টা ও বৃথা পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইতেছ

কেন? তোমাদের প্রয়াস, তোমাদের যত্ন কোন ফলোপধায়ক হইবে না। আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, যে পর্য্যন্ত না হোসেন মনসুর স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আপন মস্তক ছিদ্র-পথ-তলে অর্পণ করিবেন, তদবধি উহা কোনক্রমেই অবরুদ্ধ হইবার নহে।”

সেই গরীয়ান্ দেবসভায় স্বয়ং মনসুরও একটী আসন পরিগ্রহ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি নিখিলনাথ-বান্ধব নরকুলহিতৈষী হজরতের প্রমুখাৎ এবংবিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচনে সোৎসাহে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আহা কি অনুগ্রহ! আহা কি স্নেহ-বাৎসল্য!! আহা কি আমার সৌভাগ্য!!! প্রভো! এক মস্তক কেন? আজ যদি এই দীনাতিদীন দাসের লক্ষ মস্তক থাকিত, তাহা হইলে প্রভুর নির্দ্দেশ মত এই দণ্ডেই জগৎপ্রীতি-জনন সেই বিশ্ববিভুর কার্য্যে সাদরে উৎসর্গ করিয়া এ দাস কৃতার্থ ও ধন্য হইত। হায়! এই বসুন্ধরাতলে এমন সম্মানিত সৌভাগ্যবান্ পুরুষ কে আছে, যে ব্যক্তি জন্মমৃত্যু-রক্ষণ-ভূত আল্লার পথে আত্মজীবনোৎসর্গ করিয়া পারলৌকিক শ্রেয়ঃ লাভ সহ তদীয় প্রিয় হইতে পারে? যদি প্রণয়ীর জন্য প্রাণ যায়, যদি প্রিয়ভাজন বান্ধবের বিপদে বিপন্ন হইয়া আত্মবিনাশ ঘটে, তবে তাহা অপেক্ষা

শুভাদৃষ্ট ও সুখের বিষয় এ জগতে আর কি আছে? প্রেম করার নাম আত্মবলিদান, ইহা আমি বিলক্ষণ-রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। যে প্রেমিক আত্মবলিদানে অসমর্থ, যে প্রেমিক প্রেম-সঙ্কটে মস্তক ছেদিত হইবে বলিয়া বিচলিত ও ভয়-বিহ্বল, সে কখন প্রেমিক নহে, প্রেম কিরূপে করিতে হয়, সে জানে না ;—সে ভণ্ড, সে শঠ, সে ছদ্মবেশী ধূর্ত্ত!" জগদ্‌গুরু হজরত মহাম্মদ মহোচ্চমনা মনসুরের এইরূপ সদুত্তর শুনিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে তাঁহার অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক ঐশিক প্রেমিকতার ভূরি ভূরি যশোকীর্ত্তন করিলেন।*

অকস্মাৎ মনসুরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, জড়তা কাটিল;

* ঋষিবরের এই স্বপ্নবৃত্তান্তের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা কোন কোন মহাত্মা এইরূপ করিয়াছেন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত্রাবাসটী জগৎস্রষ্টার প্রিয় ও পরম পবিত্র বাহ্য ইস্‌লাম-ধর্ম্মস্বরূপ (শরিয়ত)। প্রধান স্তম্ভ পয়গম্বরপ্রধান হজরত স্বয়ং, তিনি অন্যান্য ধার্ম্মিকগণের সহিত উহা মস্তকে ধারণ করিয়া যত্নে রক্ষা করিতেছেন। সূর্য্যোত্তাপে তপ্ত (অর্থাৎ ধর্ম্মভ্রান্ত) নরগণ ইহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইলে অর্থাৎ শান্তিপ্রদ সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে অন্তিমে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখের অধিকারী হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-বিগর্হিত উক্তি 'আনাল হক্' মনসুর কর্ত্তৃক উচ্চারিত হওয়ায় বস্ত্রাবাসের (ইস্‌লাম ধর্ম্মের) এক স্থানে ছিদ্রস্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে। ঐ ছিদ্র অবরোধার্থ অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়া অর্থাৎ মনসুরকে 'আনাল হক্' বলিতে নিষেধ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। সেই জন্য কথিত হইয়াছে যে, যদবধি হোসেন মনসুর স্ব-ইচ্ছায় ছিদ্রপথে স্বীয় শির স্থাপন না করিবেন অর্থাৎ 'শরিয়ৎ'-নিষিদ্ধ 'আনাল্ হক্' উচ্চারণে ক্ষান্ত না হইবেন, অথবা আত্ম-বিসর্জ্জন না করিবেন, তদবধি উহা অপরের সহস্র চেষ্টায় কিছুতেই রুদ্ধ (তিনি উহা উচ্চারণে কিছুতেই নিবৃত্ত) হইবার নহে।

সঙ্গে সঙ্গে দেবসভাও নয়নের ব্যবধানে পড়িয়া গেল। তিনি জাগরিত হইয়া সে স্বর্গীয় শোভা-সমৃদ্ধি—সে সভ্যগণ-সমাবেশাদির আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না! কিন্তু সেই সুরসভা ও তাহার সভ্যবৃন্দের ক্রিয়াকলাপ তদীয় হৃদয়-ফলকে প্রতিফলিত হওয়ায় এবং মানস-যন্ত্রে প্রতিঘাত করায়, তিনি তখনও যেন তৎসমুদয়ের জীবন্ত বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন! পরন্তু সচৈতন্য ব্যক্তির এ মোহ—এ মরীচিকাময় ভাব আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? তিনি ক্ষণকাল পরেই শয়ন-কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হা-হুতাশ ছাড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দরদর-ধারে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন?—হাত নাই। অবশেষে হতাশ-মলিন-মুখে প্রেম-গদগদ ভাবে পুনর্ব্বার তিনি "হক্—হক্, আনাল হক্" বলিয়া উচ্চ ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনসুরের 'অহম্-ব্রহ্মবাদিত্বের' কথা দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইতে আর বাকী নাই। কিন্তু আজ তিনি ধৃত ও বন্দী—প্রশান্তভাবে কারাগৃহে অবস্থান করিতে-ছেন। এই সংবাদ শ্রবণে চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র লোক দলে দলে আসিয়া কারাগৃহ-সমীপে সমবেত হইতে লাগিল। বিশাল বোগ্‌দাদ নগরস্থ ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণও সেই স্থানে আসিতে ত্রুটি করিলেন না। ফলতঃ কি সংসার-জ্ঞানশূন্য তরলবুদ্ধি বালক, কি কৌতূ-হলাক্রান্ত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ, কি স্থিরবুদ্ধি বৃদ্ধ, কি পথশ্রান্ত পথিক, সকলকেই কোন না কোন প্রকার প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র হইয়া এই জনতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। সকলেই কোপ-পরায়ণ, সকলেরই মনসুরের প্রতি রোষ-কষায়িত দৃষ্টি। কত জনে কত কথা বলিতেছে; কোলা-হলের গম্ভীর ধ্বনি তাল বাঁধিয়া গম্ গম্ করিয়া উঠি-তেছে। পরিশেষে কতকগুলি লোক বহু প্রকার তীব্রোক্তি করিয়া মনসুরের জীবননাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। সেই স্থানে মহর্ষির সহাধ্যায়ী বন্ধু সুধীবর শেখ আবুবকর শিব্‌লীও সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রিয় বন্ধুর আসন্ন বিপদের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত

হইয়া নিরতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন। তখন তিনি সর্ব্বলোক-পূজনীয় মহামনস্বী ধর্ম্মগুরু সৈয়দ জুনেদ শাহের নিকটে আসিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে সমুদয় নিবেদন করিতে আর ক্ষণবিলম্ব করিলেন না।

জ্ঞানবৃদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য জুনেদ শাহ্ এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন—তাঁহার মুখকান্তি সহসা রূপান্তরিত হইল। অতঃপর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কতিপয় ধার্ম্মিক লোকের সহিত শশব্যস্তে কারাগৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, সংখ্যাতীত লোকের সমাগম হইয়াছে। কি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার! সকলের উত্তেজনা ও অভিপ্রায় দেখিয়া-শুনিয়া তিনি ভীত হইলেন; কি যে বলিবেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক ধীরগম্ভীরে কহিলেন,—"হে ইস্‌লামের ধর্ম্মভীরু প্রিয় সন্তানগণ! হে সমাজের রক্ষণশীল পুরুষবর্গ! আপনারা আজ ধর্ম্মের জন্য—ধর্ম্মাবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলাম। ইহা আপনাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার জ্বলন্ত উদাহরণ,—সমাজের জীবন্ত শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী কথা; বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া কোন গুরুতর

কার্য্যে উৎসাহিত ও অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। আমি ভরসা করি, ঈশ্বরেচ্ছায় আপনারা আমার বাক্যে বিরক্ত না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। দেখুন, এই মনসুর অবোধ নহেন; ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ও অচলা ভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইস্‌লাম-সম্মত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। তবে মাত্র একটী কথার নিমিত্ত আজ আপনারা তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন—হইবারই কথা। যেহেতু প্রদীপ্ত হুতাশন-সন্তাপে পদার্থমাত্রেই উত্তপ্ত হইয়া থাকে। আবার যদি সেই অগ্নি নিস্তেজ বা একেবারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তবে তাবত বস্তুরই শীতলতা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। তাই বলিতেছি, মনসুর যদি সেই কোপোদ্দীপক বাক্য উচ্চারণে চিরবিরত থাকেন, তবে কি তিনি ক্ষমার পাত্র নহেন? দোষ মনুষ্যেই করিয়া থাকে, ক্ষমাও মনুষ্য-হৃদয়ের এক অদ্বিতীয় মধুর গুণ! তাই বলিতেছি,—আপনারা অবশ্যই শান্ত ভাব অবলম্বনে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন—তাঁহার প্রতি দয়া করিবেন। আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, তাঁহার রসনা হইতে 'শরা'-বহির্ভূত নিষিদ্ধ বাক্য আর কদাপি বহির্গত হইবে না।"

এই কথা বলিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ সৈয়দ সাহেব মনসুরের

নিকট গমন করিলেন এবং প্রীতিপূর্ণ বচনে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন,—"এ কি মন্‌সুর! সহসা তোমার ঈদৃশ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল কেন? কোন্ ঘটনায় তোমার বাগিন্দ্রিয়কে এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব ন্যায়-বিরুদ্ধ নিন্দিত বাক্যস্ফুরণে বাধ্য করিয়াছে? স্থির-ভাবে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বল।" তখন ধর্ম্মোন্মত্ত মন্‌সুর, "আমার এক মুহূর্ত্তেরও অবসর নাই, আমাকে একটু অবসর দিউন" ইহাই বলিয়া প্রসন্নভাবে অন্য দিকে বদন ফিরাইলেন। তদ্দর্শনে সৈয়দ সাহেব কথঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"মন্‌সুর! তুমি এ প্রকার বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ কর, ভয়ানক পাপ কথা আর মুখাগ্রে আনিও না, প্রকৃতিস্থ হও। তোমার শ্রবণকঠোর পাপময় বাক্যে—তোমার বৃথাভিমানে জগৎ সন্তুষ্ট নহে। যে দাবী মানবকুলে কেহ কখন করে নাই,—করিবার সামর্থ্যও নাই, যে কথা কর্ণেও কেহ শুনে নাই, আবালবৃদ্ধবনিতা যাহাতে মহাপাপ অর্শে বলিয়া জ্ঞান করে, এক জন কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খও যে কথা শুনিলে সঙ্কুচিত ও ভয়বিহ্বল হয়, আজ তুমি এক জন ক্ষণভঙ্গুর সসীম শক্তি ক্ষুদ্র মানব হইয়া তাহা উচ্চারণ করিলে,—এবং তদ্দ্বারা 'শরিয়তের' অব-মাননা করিলে, মোস্‌লেম-সমাজ কোনক্রমেই সহ্য করিতে

প্রস্তুত নহে। আমি তোমার উপদেষ্টা ও মঙ্গলার্থী। তোমার অমঙ্গল ঘটিলে আমার যাদৃশ কষ্ট অনুভব হইবে, তেমন্ আর কাহারও হইবে না। অতএব স্থির হও, আমার কথা শ্রবণ কর, সুনির্ম্মল সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মস্তকোত্তোলন করিও না—বিঘ্ন ঘটাইও না। অন্যথা তোমার ঈশ্বরপ্রেমিকতা—ধ্যান-ধারণা কোন ফলোপধায়ক হইবে না, তুমি পরিশ্রমের পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, শিক্ষা-দীক্ষার অসহ্য গুরু ভারে তোমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি জন্মিয়াছে। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথ হইতে অপসৃত হইয়াছ—তুমি তোমার স্পৃহনীয় লক্ষ্য-পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছ, জলভ্রমে তরঙ্গায়িত মরীচিকার দিকে ধাবিত হইতেছ। এখনও বলিতেছি, যদি কল্যাণ কামনা কর, সরল এবং সুপথে আইস। ইহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ যে, আল্লাহ্ অতি মহান্, সর্ব্ব শক্তির আধার, অক্ষয় এবং অদৃশ্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। তাঁহার সদৃশ কেহ বা কিছুই নাই। তাঁহার দান বা সৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, তৃণ, বায়ু, সিন্ধু, সরিৎ, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র, পর্ব্বত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, শূন্য, দিবা, রজনী, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি। তবে বল দেখি, এমন মহিমময় মহাদাতার দাবী করা—তৎস্থানীয়

হইতে যাওয়া, রক্তমাংস-অস্থি-মাজ্জা-গঠিত অচির-দেহধারী শঙ্কীর্ণশক্তি মনুষ্যের পক্ষে কি কোনক্রমে শোভা পায়? আর যদি তোমার উক্তি যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়ানুমোদিত হইত, তাহা হইলে নরের অনন্যশরণ প্রেরিতপুরুষ-প্রভাকর মহামান্য হজরত মহাম্মদ মোস্তফা 'শেরেকী' অর্থাৎ খোদাতালার অংশী-স্থাপন করা বা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে তত্তুল্য জ্ঞান করা মহাপাপ বলিয়া কদাচ নিষেধ করিয়া যাইতেন না। তিনি পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষের অগ্রগণ্য—পূজনীয়—সংখ্যাতীত নক্ষত্রের মধ্যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃপূর্ণ অকলঙ্ক শশধরস্বরূপ। আহা! যে পূর্ণ চন্দ্রের নির্ম্মল আলোকে অখিল বিশ্ব আলোকপ্রাপ্ত, পবিত্র কোরাণের বিধি এবং তাঁহার আজ্ঞা অবহেলন করা যে কত দূর ন্যায়বিবর্জ্জিত ও দূষণীয় কার্য্য, তাহা কি তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না? তাই পুনঃ বলিতেছি, মনসুর! যদি বুদ্ধিমান্ হও, অবিলম্বে এই পথ পরিত্যাগ কর; মহাপুরুষের পথানুসরণ করিয়া আত্মকল্যাণে রত থাক।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সাধক মনসুর উন্নতশীর্ষে চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক বিরক্তি সহকারে স্বীয় দীক্ষাগুরু সৈয়দ জুনেদকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "আপনি

আমার গুরু, সুতরাং নতমস্তকে আপনাকে অভিবাদন করি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে আমি কুণ্ঠা বোধ করিব না। আপনি কেন আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? আপনার বচন-পরম্পরায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রেমের মাহাত্ম্য এখনও আপনি বুঝিতে সমর্থ হন নাই, ইহার সুমধুর রসাস্বাদনে আপনি বঞ্চিত আছেন। যদি প্রেম-তত্ত্বে আপনার অণুমাত্রও অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আজ আমার প্রতি কঠিন কুলিশোপম হৃদয়-বিদারী বাক্যবাণ বর্ষণে উদ্যত হইতেন না। আর বলুন ত, পয়গম্বরশ্রেষ্ঠ হজরত মহাম্মদ সম্বন্ধে আপনি কি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন? তাঁহার ইঙ্গিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করা সাতিশয় কঠিন ব্যাপার। তিনি বলিয়াছেন, "বিশ্ব-পাতা খোদা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছেন" এবং ধর্ম্ম-গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে, "আমি (সৃষ্টিকর্ত্তা) মনুষ্যের নিকট হইতেও অতি নিকটে আছি।" এক্ষণে বলুন দেখি, আপনি ইহার কিরূপ মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি প্রকাশ্য কার্য্যকলাপে, বাহ্য অনুষ্ঠানে, লৌকিক আচার-ব্যবহারে বিশেষরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বলুন দেখি, চাকচিক্যময় বহির্ভাগ দেখিয়া ভিতরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায় কি? কখনই

না। তাই বলিতেছি, কেবল বাহ্য আড়ম্বরে কিছুই হইবে না, অন্তর ও বাহির নির্ম্মল এবং একই কেন্দ্রাভিমুখী করা চাই। যেমন কোন পাত্রের অন্তর ও বহির্ভাগ সম্যক্ পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত হইলে স্বতঃই উহা দর্শকের ভক্তি ও শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শাস্ত্রোক্ত প্রকাশ্য ও গুপ্ত ('শরিয়ৎ' ও 'মারফৎ') উভয়বিধ ধ্যান-ধারণার সমতা রক্ষা করিতে পারিলে সেই বিশ্বকল্পতরু মহিমময় মহীপতি স্বয়ং প্রসন্নচিত্তে ভক্তকে অমৃতরসাভিষিক্ত মধুর ফল প্রদান করিবেন, নতুবা নহে। তুলাদণ্ডের এক দিক্ ভারাক্রান্ত করিলে দণ্ড কোন্ কালে সমভাবে সরল পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? আহা! পবিত্রতম স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরাণ-শরিফে যে অভিপ্রায় সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত রহিয়াছে, আপনার হৃদয়ক্ষেত্রে তাহার ছায়ার লেশমাত্রও নিপতিত হয় নাই। তবে আপনি কেমন করিয়া প্রেরিতপুরুষের প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিলেন? স্বাদ গ্রহণ না করিলে কোন্ বস্তু মিষ্ট, তিক্ত বা কষায়, তাহা বলিতে পারা যায় কি? ফলতঃ নিজে ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অক্ষম হইয়া অপরকে প্রকাশ্যে ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া অপবাদ দেওয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু বৃথা বাদানুবাদে কোনও সুফল সমুদ্ভূত হয় না। কি জন্য

আমি ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলাম, বিশেষরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে আপনি তাহার শাস্ত্রসম্মত উত্তর প্রদান করুন। আমি যাহা করি, তাহাই উৎকৃষ্ট, তাহাই খোদাতালার অনুমোদিত, তাহাই যুক্তিযুক্ত কার্য্য, এরূপ বোধ করা কদাচ সমীচীন নহে—ভ্রান্তমতি স্বল্পধী মানবের পক্ষে সঙ্গত নহে। আপনার পথটী সরল কি বক্র, অগ্রে তাহার অবধারণ করা কর্ত্তব্য। কে না জানে, এ সংসারে সত্যপথ কণ্টকময় ও বিপজ্জনক! কে না জানে সে পথে নানা প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হইয়া থাকে? হায়! আজ আমাকে ন্যায়ের অনুরোধে আবার বলিতে হইল যে, সে পথের পথিক হইতে আপনি অসমর্থ; তাহাতে অনেক সৌভাগ্য, অনেক সহিষ্ণুতা, অনেক সম্বলের প্রয়োজন। আপনার সে সম্বল কৈ? খোদাতালার প্রকৃত একত্ব বিষয়ক জ্ঞানের অধিকার আপনার কোথায়? আপনার অন্তরে প্রণয়ের ভীষণ প্রতিবন্ধক স্বরূপ লক্ষাধিক সুদৃঢ় যবনিকা প্রলম্বিত, সুতরাং সেই প্রেমময় নিখিলনাথের নির্ম্মল প্রেম লাভ করিয়া অপার্থিব অনন্ত সুখে সুখী হইতে পারিবেন কিরূপে? আপনার-জ্ঞান-নয়ন প্রস্ফুটিত হইবার এখনও বিলম্ব আছে।"

উন্মত্ত আত্মহারা মনসুর মনের আবেগে জলদগম্ভীরে এতদূর বলিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। উত্তাল

তরঙ্গসঙ্কুল জলধি সহসা যেন স্থির—তরঙ্গ-রহিত হইল। তখন সৈয়দ সাহেব তাঁহার এইরূপ স্পর্দ্ধা সম্বলিত তেজস্কর বাক্য শ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। চিত্রপুত্তলিকাবৎ ক্ষণকাল নীরব ও নিস্পন্দ! অতঃপর আর বাক্য ব্যয় বৃথা জানিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনায় সাধারণ জনগণ ক্রোধে অধিকতর উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিল। "মৃত্যুকালে বিপরীত বুদ্ধি ঘটে, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, সে লক্ষণ মনসুরের যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। এখন হিতগর্ভ উপদেশ বা প্রবোধ প্রদান, ইহার কিছুই ফলোপধায়ক হইবে না। স্বয়ং পূজ্যপাদ শিক্ষাদাতা যখন কুশল সাধন করিতে গিয়া অপদস্থ ও নৈরাশ্য-সন্তপ্ত হইয়া প্রস্থানপর হইলেন, তখন আর ইহার মঙ্গল কোথায়?" এইরূপ নানা জনে নানা কথা উত্থাপন করিয়া মহর্ষির প্রাণসংহারের নিমিত্ত অধৈর্য্য ও আগ্রহাতিশয্য দেখাইতে লাগিল।

তখন কতিপয় ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি বলিলেন, "মনসুর মহাপরাধী—প্রাণদণ্ডার্হ সত্য বটে, কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত বিধান ব্যতিরেকে কাহারও প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। তাই বুদ্ধিমান্ উজির ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে একত্র করিয়া 'ফতোয়া' গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বজনগুরু,

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সুফী-সঙ্ঘের সূর্য্যস্বরূপ, সেই মহাতপা সৈয়দ শাহ্ জুনেদের অভিমত ও উক্তির গ্রহণ করেন নাই! এ বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সকলে ইহা পরামর্শ করিয়া সৈয়দ জুনেদ শাহের নিকটে গিয়া ব্যবস্থাপ্রার্থী হইলেন। তখন জ্ঞান-বৃদ্ধ শাহ্ প্রেমোন্মত্ত মনসুরের সম্বন্ধে অভিমত দানের কথা শুনিয়া নিস্পন্দ ও নিরুত্তর রহিলেন,—সেই জ্ঞান-বৃদ্ধের দুই চক্ষু হইতে গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল ধারে বাষ্প-বারি বিগলিত হইতে লাগিল, তাঁহার শোক-সিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া সহস্র ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তদুপরি আবার দীর্ঘনিশ্বাস-ভীম-বাত্যাঘাতে তাঁহার অন্তরাত্মা যে কিরূপ নিদারুণভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিল, তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অপরের বোধগম্য নহে! ফলতঃ তিনি যে অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা মনসুরের আসন্ন বিপদে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বুঝিতে কাহার আর বাকী রহিল না।

ব্যবস্থাপ্রার্থীরা সৈয়দ সাহেবের অবস্থা অবলোকনে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও তাঁহার অভিমত প্রদানের অভিরুচিসূচক কোন ভাবই লক্ষিত হইল না,—একটী বাক্যও স্ফুরিত হইল না। তিনি কেবল নীরবে কাতরভাবে অশ্রুবিসর্জ্জন

করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া [illegible] [illegible] গণ অতিশয় বিরক্ত হইলেন,—কাহারো [illegible] [illegible] চ্যুতিও ঘটিল। কিন্তু তাহা হইলে কি [illegible] [illegible] কারণে সে অধৈর্য্যাবেগ সম্বরণ করিতে হইল। রাজাধি-পতি খলিফার গোচর করিলে সহজেই ইহার প্রতীকার হইবে বিবেচনায়, সকলে সমবেত হইয়া অবশেষে মহামান্য খলিফার দরবারে উপনীত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা যথাবিধি তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন।

দরবারের বিচারকার্য্যে নিয়োজিত জনৈক সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী আগন্তুকগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া চমকিত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিয়া বিনীতভাবে খলিফাকে কহিলেন,—"জাঁহাপনা! মাননীয় উজির সম্মিলিত ধর্ম্মাচার্য্যগণের স্বাক্ষরিত ব্যবস্থালিপি হস্তগত করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দুরূহ কার্য্য কার্য্যে পরিণত করিবার অগ্রে পরম শ্রদ্ধেয় তাপস সৈয়দ জুনেদ শাহের অভিপ্রায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু তিনি দরবেশকুলের শ্রেষ্ঠ এবং সুফী-সঙ্ঘের গুরুস্থানীয়, তিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করিবেন, তাহাই সর্ব্ববাদিসম্মত ও শিরোধার্য্য হইবে। তাই পুনঃ নিবেদন করিতেছি, তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া একার্য্যে অগ্রসর হওয়া অবিধেয়"।

খলিফা প্রজারঞ্জক, ন্যায়বান্ ও নিতান্ত ধর্ম্মভীরু

ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শাসনশৃঙ্খলা ও সুবিচারের ত কথাই ছিল না, কিন্তু সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের দিকে সতত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকায় ঈশ্বরানুগ্রহে তদীয় সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য মধ্যে ধর্ম্মবহির্ভূত কোন একটী সামান্য কার্য্য সংঘটিত হওয়া দূরে থাকুক, একটী বিরুদ্ধ বাক্যও উচ্চারিত হইতে পারিত না। কিন্তু আজ বিষম বিপরীত ভাব সন্দর্শনে তিনি সাতিশয় মর্ম্মাহত, বিস্মিত, বিচলিত ও চিন্তাকুল হইলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি অজ্ঞান বা সাধারণ লোক হইলে ভাবিবার এত অধিক প্রয়োজন ছিল না, পরন্তু এ ত যে সে ব্যক্তি নহে, ইনি ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ পরম জ্ঞানী মনসুর—মনসুরের বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ডের অভিযোগ! কি সর্ব্বনাশকর ঘটনা!! ইহা যে ভাবিবারই ক্ষেত্র! বিশেষতঃ ধর্ম্মাধিকরণে উপবিষ্ট হইয়া আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ন্যায়সঙ্গত কার্য্য করাই যথার্থ সুবিচারক ও সর্ব্বলোকে প্রশংসিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যিনি তাহাতে অক্ষম, যাঁহার সে দৃঢ়তা নাই, সেই দুর্ব্বলচেতা ভীরু মানব ধর্ম্মজগতের পরিরক্ষক খলিফা-পদবাচ্য নহেন, তিনি সুবিচারক ও প্রশংসার্হ বলিয়া পরীকীর্ত্তিত হইতেও পারেন না। এই ধারণা বশতঃ বিচক্ষণ খলিফা আল্ মোক্তাদীর বিল্লাহ্ স্বয়ং চিন্তাবিহ্বলচিত্তে অর্থি-প্রত্যর্থীস্বরূপে মনে মনে বহু বাদানুবাদ, বহু তর্কবিতর্ক

করিলেন। পরিশেষে বুঝিলেন, ধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব খর্ব্ব-করণে-উদ্যত মনসুর দণ্ডের যোগ্য বটেন। তখন রাজকর্ম্মচারীর কথা যুক্তিমূলক বিবেচনা করিয়া ধর্ম্ম-পরিরক্ষণার্থ ব্যবস্থা প্রদান জন্য তিনি পণ্ডিতপ্রবর শাহ্ জুনেদের নিকট পত্র প্রেরণে বাধ্য হইলেন।

পত্র লিখিত হইল। আজ্ঞানুসারে রাজকীয় লেখক লিখিলেন—"মহাত্মন্! উন্মত্ত মনসুর সুনির্ম্মল ইস্‌লাম ধর্ম্মে যে কি দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা প্রলেপন করিতে—চিরন্তন সরল বিশ্বাসের মূলে সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, তাহা আর আপনার অবিদিত নাই। আজ মোস্‌লেম সমাজ তাঁহার সেই কৃতপরাধের—সেই ধৃষ্টতার সমুচিত প্রতিবিধান করিতে বদ্ধপরিকর। আপনি ধর্ম্মবিৎ এবং পণ্ডিতকুলের শীর্ষস্থানীয়, আপনার ধর্ম্মভীরুতা চিরপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্মের অবমাননা আপনার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ বাণের ন্যায় যাতনা প্রদান করে। অতএব আশা করা যাইতে পারে যে, মনসুরের এই অকথ্য আচরণের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত শাস্ত্রানুমোদিত যে ব্যবস্থা হয়, তাহা প্রদান করিয়া সত্য সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে আপনি ক্রটি করিবেন না। অঙ্কুরে ইহার মূলোৎপাটন না করিলে, কালে ইহা শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্মজগতে নিদারুণ বিপ্লব উপস্থিত

করিতে পারে, আপনার ন্যায় ভবিষ্যদ্দর্শী ব্যক্তিকে একথা লেখাও বাহুল্য মাত্র।”

খলিফার স্বাক্ষরিত এই পত্র প্রেরিত হইল। অভিযোক্তাগণও যথারীতি নম্রতার সহিত খলিফাকে অভিবাদন করিয়া পত্রবাহকের সহিত চলিলেন। আনন্দের আর সীমা রহিল না, খলিফার লিপি পাইয়া কোলাহল করিতে করিতে সকলে ছুটিলেন এবং ব্যস্ততার সহিত মাননীয় জুনেদ শাহের হস্তে পত্র অর্পণ করিলেন। জনসঙ্ঘ ‘ফতোয়া’-প্রাপ্তির আশায় চারিদিকে দণ্ডায়মান,—সতৃষ্ণ নয়নে ‘ফতোয়া’-দাতার মুখ নিরীক্ষণ করিতে নিরত। এদিকে কিন্তু শাহ্‌ পূর্ব্ববৎ নীরব, নিরুত্তর ও কাতর-ভাবাপন্ন। তিনি প্রথমতঃ খলিফাপ্রদত্ত পত্রখানি সম্মাননার সহিত গ্রহণপূর্ব্বক চুম্বন করিলেন। তৎপরে পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি লোমহর্ষণ—কি বেদনাব্যঞ্জক ব্যাপার! পাঠমাত্র তাঁহার বিষাদসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, দর-বিগলিত অশ্রু-ধারে লিপি অভিষিক্ত হইয়া গেল। ধৈর্য্যহীন আগন্তুকের দল ব্যবস্থাদাতার এই লক্ষণ তাঁহাদের আশাপ্রদ নহে দেখিয়া, কিছুক্ষণ পরে পুনর্ব্বার খলিফার দরবারে যাইয়া অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। স্থিরধী খলিফা তাহাতে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ

হইলেন না,—'ফতোয়া'র জন্ত পুনঃ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। এইরূপে ছয় বার আগন্তুকদলের আগমন,—ছয় বার পত্র প্রেরিত হইল, তথাপি 'ফতোয়া' হস্তগত হইল না,—ব্যবস্থাদাতার মনের ভাব পূর্ব্বের ন্যায় অপরিবর্ত্তিত, অচল ও অটল!—হাঁ কিংবা না, ইহার কোন কথাই তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল না।

এদিকে নগরবাসীদের উত্তেজনার বিরাম নাই। তদ্দর্শনে মহামান্য খলিফা সপ্তম বার শাহ্ জুনেদের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। তখন সেই বৃদ্ধ তপস্বী বিচলিত এবং বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বারংবার রাজাজ্ঞা অবহেলন বা প্রত্যাখ্যান করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। যদি করেন, তাহা হইলে সাধারণের অপ্রিয়ভাজন, দেশবিদেশে নিন্দিত এবং খলিফার কোপদৃষ্টিতে পড়িলেও পড়িতে পারেন। বিশেষতঃ পবিত্র 'শরিয়ত'কে অক্ষুণ্ণ ও গৌরবান্বিত রাখাও সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। মনোমধ্যে এইরূপ অশেষবিধ চিন্তার আবির্ভাব হওয়ায় তিনি পরিশেষে বাধ্য হইয়া ব্যবস্থা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তখন তিনি শান্তচিত্তে হস্তপদাদি প্রক্ষালন দ্বারা ('অজু' করিয়া) পবিত্র হইয়া সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন জগন্নিদান জগদীশ্বরের নামোচ্চারণপূর্ব্বক প্রথমতঃ সূফীর সজ্জা (আধ্যাত্মিক

পরিচ্ছদ) পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক ব্যবস্থাপকের পোষাক পরিধান করিলেন। অনন্তর চিন্তিতচিত্তে লেখনী গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে মহিমময় বিশ্বস্রষ্টা আল্লার মহান্ নামের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন, পরে কৌশলের সহিত লিখিলেন,—"যে মানব নির্ব্বিকার নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ অদ্বিতীয় জগৎস্রষ্টার অংশী স্থাপন করে, ঐশিক দাবী-দাওয়া করে, সে নিন্দিত, ঘৃণিত, ধর্ম্মদ্রোহী, ইস্‌লাম-বিরোধী ও মহাপাপী। শাস্ত্রের বিধানানুসারে যদি ইহার প্রকাশ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, তবে তাহার শিরশ্ছেদনই প্রশস্ত প্রায়শ্চিত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার অন্তরের অবস্থা মানবের অজ্ঞাত, তাহা একমাত্র আল্লাই জানেন।" *

সৈয়দ সাহেব এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আগন্তুকদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। তাঁহারা ব্যবস্থা

* এব্‌নে খাল্লিকানের প্রসিদ্ধ ইতিহাসে মহর্ষির প্রাণদণ্ড হিজরী ৩০৬ সালে এবং শাহ্ জুনেদের তিরোভাব হিজরী ২৯৮ সালে ঘটে, লিখিত আছে। যদি তাহাই হয়, তবে মনসুরের বিরুদ্ধে তাঁহার 'ফতোয়া' প্রদান ও তৎসহ তর্কবিতর্ক করা একেবারে অলীক ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এদিকে কিন্তু আবার "তাজকেরাতল আউলিয়া" গ্রন্থে মনসুরের প্রাণদণ্ড সময়ে শাহ্ জুনেদের বিদ্যমানতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়া থাকে। এমত স্থলে উক্ত ইতিহাসে মহর্ষিদ্বয়ের তিরোধান-কাল যে অভ্রান্তরূপেই লিখিত হইয়াছে, তাহা কে বিশ্বাস করিবে? ফলে মহর্ষির জীবনকালে শাহ্ জুনেদ বিদ্যমান ছিলেন এবং ফতোয়াও দিয়াছিলেন, একথা অবিশ্বাস্য নহে।

পাইয়া জুনেদ শাহ্‌কে অভিবাদনপূর্ব্বক মহানন্দে কোলাহল করিতে করিতে আপনাদের গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

'ফতোয়া' হস্তগত হইয়াছে, মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে; নগরবাসীদের আর আনন্দের সীমা নাই। খলিফার আদেশে আজ মন্‌সুরের প্রাণদণ্ডের দিন। শৃঙ্খলিত মন্‌সুর সশস্ত্র প্রহরীপরিবেষ্টিত হইয়া বধ্য-প্রান্তরে আনীত হইয়াছেন। তাই দলে দলে লোক আসিয়া সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমবেত হইতেছে। ধনী মধ্যবিৎ দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবক, পণ্ডিত শিক্ষার্থী মুর্খ, মুক খঞ্জ বধির,—কেহই আর আবাসে নাই, সকলেই চলিয়াছে, প্রখরগতি নদী-স্রোতের ন্যায় মনুষ্য-স্রোত চলিয়াছে। রাজপথ জনতাপূর্ণ—কোলাহলময়; কল্ কল্ গল্ গল্ শব্দে সমগ্র বোগ্‌দাদ নগর শব্দায়মান, আকাশমণ্ডল প্রতি-ধ্বনিত—গম্ গম্ করিতেছে। সহস্র সহস্র নরকণ্ঠস্বর একত্র সংমিশ্রিত হইয়া এক গম্ভীর শব্দ উৎপাদন করিতেছে। দূর হইতে সেই শব্দ অধিকতর ভীষণ ও গম্ভীর অনুমিত হইতেছে। কত জনে কত কথা বলিতেছে। কত বাক্‌বিতণ্ডা, কত হা-হুতাশ, কত শ্লেষবিদ্রূপ, কত পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হইতেছে। কেহ উৎফুল্ল নয়নে তামাসা দেখিবার জন্য খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছে, কেহ বা বিষণ্ণচিত্তে নীরবে

সমবেত মানবমণ্ডলীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কেহ বা "হা হতভাগ্য মন্‌সুর! শেষে তোমার ভাগ্যে এই ছিল" বলিয়া অবশাঙ্গে বসিয়া আক্ষেপ করিতেছেন। কেহ বা বলিতেছে, "ধর্ম্মদ্রোহীর কঠিন শাস্তি হওয়াই উচিত, তাহাতে কাহারও ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই।"

মন্‌সুরের সহাধ্যায়ী দরবেশ শেখ আবুবকর শিব্‌লী মহোদয় বন্ধুর এই দৈব দুর্ব্বিপাকে সমধিক মর্ম্মাহত ও বিষণ্ণ। তাঁহার হৃদয়ে যেন পাষাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল। যদি কোন প্রকারে এই বিপত্তির নিরাকরণ করিতে পারেন, যদি কোন কৌশলে মন্‌সুরের মনের গতি ফিরাইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি শশব্যস্তে মন্‌সুরের সমীপস্থ হইলেন এবং বহুবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা করার পর দুঃখের সহিত প্রবোধ-বাক্যে কহিলেন, "ভাই, জানিয়া শুনিয়া আপনার প্রাণ আপনি বিসর্জ্জন করিতে চলিলে! ইহা কি তোমার ন্যায় সুপণ্ডিত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির অনুরূপ কার্য্য? যে হৃদয় সুদৃঢ় নগরাজ সদৃশ অটল ও অদম্য ছিল, আজ তাহা সহসা বিচলিত ও বিপর্য্যস্ত হইল কেন? কোন্ সূত্রে কোথা হইতে এই চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিত হইয়া তোমাকে এই নিদারুণ অবস্থায়

পাতিত করিয়াছে ? তোমার সেই অবিচলিত অধ্যবসায়, সেই অমানুষিক সহিষ্ণুতা, সেই দেব-দুর্লভ ইন্দ্রিয়-সংযম, সেই প্রখর বিবেকবুদ্ধি আজ কোথায় ? গুরূপ-দেশের কি এই পরিণাম ? নির্জ্জন ধ্যান-ধারণা, অসামান্য শাস্ত্রাভিজ্ঞতা শেষে কি অজ্ঞানতায় পর্য্যবসিত হইল ? যে বিষয় এক ব্যক্তি সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু জগৎ অসত্য ও অন্যায় জ্ঞানে ঘৃণা, নিন্দা ও বিপক্ষতা করিয়া থাকে, এবংবিধ কার্য্য হইতে নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয়ঃ। তোমার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এ কথাও কি আবার বুঝাইয়া দিতে হইবে ? কিন্তু তথাপি বন্ধুত্ব ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতেছি, তোমার উচ্ছৃঙ্খলা ঊর্দ্ধগা প্রবৃত্তিকে সংযত কর, আলোড়িত চিত্তকে সুস্থির কর। এখনও নিরস্ত হও, রসনাগ্রে সেই অবৈধ উক্তিটীর আর প্রবেশাধিকার দিও না, স্মৃতি হইতে সেই বিঘ্নকরী স্মৃতিমূল উন্মূলিত করিয়া ফেল। দেখি, আজ কোন্ ব্যক্তি তোমার প্রতিকূলে আর বাক্যমাত্র ব্যয় করিতে অগ্রসর হইতে সাহস করে ? এই যে সমবেত অগণ্য নাগরিক তরঙ্গোচ্ছ্বাসিত দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধু সম রোষকষায়িতলোচনে তোমার বিরুদ্ধে খড়গহস্ত,—তোমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত, দেখিবে, এই মুহূর্ত্তেই তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সাদর সম্ভাষণে তোমাকে হিতবান্

বন্ধু জ্ঞানে আলিঙ্গন করিবে। তাই বলিতেছি, ভাই! শান্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর, হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিতে সচেষ্ট হও।"

বাক্যস্রোত রুদ্ধ হইল। মনসুরের কর্ণকুহরে বন্ধুর এই শীতল বাক্য প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু মনোমধ্যে ক্ষণকালের জন্যও স্থানলাভ করিতে সমর্থ হইল না। বিজনারণ্যে রোদনের ন্যায় তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। দর্শিবেই বা কি প্রকারে? যখন প্রেমোদ্দীপ্ত—মোহাভিভূত পতঙ্গ অকৃত্রিম প্রেমাবেশে ক্ষিপ্ত হইয়া সমুজ্জ্বল দীপশিখা আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হয়, কিন্তু যে পতনমাত্রই ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে, তখন তাহার সে আশঙ্কা বা সে জ্ঞান কি থাকে? কখনই নহে। সেই জন্যই এই আসন্ন বিপদেও মনসুর বিকারশূন্য—চিন্তার লেশমাত্র নাই, হাসিতে হাসিতে অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "দয়ার্দ্র সখে! সমস্তই বুঝিয়াছি, আমি সমস্তই জানি। কিন্তু আর গভীর অনুশোচনায় বা তীব্র তিরস্কারে ফল কি? তোমার উপদেশরূপ অঙ্কুশ-প্রহারেও আমার উন্মত্ত মনোমাতঙ্গ বারণ মানিতে চাহে না! আমি যে সেই জন্মমৃত্যুনিয়ন্তা, ভাগ্যলিপি-প্রণেতা মহান্ আল্লার নামে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি!! প্রাণের প্রতি আর মায়া নাই,—মমতা নাই,—স্নেহ নাই,—সমস্তই

বিদায় দিয়াছি,—চির বিদায় দিয়াছি। ভয় কিসের? আর কাহার ভয় করিব? হৃদয় পাষাণ করিয়াছি। হউক শত বজ্রপাত, এ হৃদয় পাতিয়া দিব!! ভাই! আমি প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত—উত্তাল তরঙ্গ-তাড়নায় হাবুডুবু খাইতেছি, উঠিবার সামর্থ্য নাই। এ সমুদ্র অপার, অসীম, অনন্ত, অতলস্পর্শ। আমি দিক্‌-হারা—যে দিকে তাকাই দেখিতেছি, কেবল অনন্ত জল-রাশি থৈ থৈ—তর্ তর্ করিতেছে। হায়, অশেষ যত্নে—প্রাণপণ শক্তিতে অন্বেষণ করিয়াও ইহার তীরভূমি পাইবার উপায় নাই। ফলতঃ বিপদের ভ্রূকুটিতে আমি আর শঙ্কিত নহি। কারণ শাস্তি এবং সুখ, উভয়ই আমার পক্ষে তুল্য। সখে! আমি ত এখন জীবনীশক্তিরহিত জড়পিণ্ড! আমি ত মৃত!! কি আশ্চর্য্য, মৃত ব্যক্তিকে মরিতে হইবে বলিয়া কি পুনঃ ভয় প্রদর্শন করিতে হয়? মরার উপর খাঁড়ার প্রহার মূর্খের কার্য্য—নিতান্ত কাণ্ড-জ্ঞানহীন অর্ব্বাচীনের প্রস্তাব! ভাই! তোমরা আর আমাকে মনসুর বলিয়া ডাকিও না—জানিও না; এখন আমি আর তোমাদের সেই মনসুর নহি। আমার আমিত্ব কোথায়? প্রেমময়ের সত্তায় আমার আমিত্ব মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, ডুবিয়া গিয়াছে। আকাশ পাতাল এক হইয়াছে। একাকার!—একাকার!! সব একাকার!!!

অগ্র-পশ্চাৎ, দক্ষিণ-বাম, ঊর্দ্ধ-অধঃ যে দিকেই নেত্রপাত করি, সব একাকার দেখিতেছি—এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। যদিও সংপ্রতি আমি মনুস্যুর নামে অভিহিত, কিন্তু সেই একের একত্ব হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহি! আমার এই শরীরে সেই অদ্বিতীয়ের ঐশ্বর্য্য গুপ্ত নাই এবং এই নামে তাঁহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য অপ্রকাশ নাই! হায় হায়, বাহ্য দৃশ্য দেখিয়াই জগৎ বিমোহিত। আভ্যন্তরিক মধুর ভাব দেখিতে জগতের চক্ষু নাই, অথবা অসমর্থ। কাহারও কি চক্ষু নাই? কেহই কি স্পৃহণীয় গুপ্ত রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ নহে? সুগভীর রত্নাকর-গর্ভস্থিত মহামূল্য মুক্তা উত্তোলন করিতে ক্ষমবান্ ডুবারি কি একেবারেই বিরল? অথবা হইতে পারে, জগৎ এ তত্ত্ব অনবগত! কিন্তু আর বিলম্ব নাই; শীঘ্রই এ কথা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইবে, জগতের নরনারীর কাণে বাজিবে,—চক্ষুষ্মান্ প্রেমিকগণের নিকটে এ দৃশ্য প্রতিভাত হইবে। অচিরে আমি আত্ম-বলিদান করিয়া আপনাকে নিরস্তিত্বে পরিণত করিব, সেই মহান্ প্রেমিকের প্রেমে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া পরম সুখকর নবজীবন লাভ সহ চিরস্থায়ী অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইব। আহা! প্রেমে যে ব্যক্তি পরিপক—দক্ষ, প্রেমিকের প্রতিচ্ছায়া—প্রেমের অবস্থা তাহাতে পতিত ও প্রকাশিত হইবেই হইবে। যে বর্ণে

বস্ত্র রঞ্জিত করিতে হইবে, বস্ত্রে তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই বর্ণ কি তাহাতে প্রতিফলিত হয় না? রঞ্জিত বস্ত্র সবাই দেখে, দেখিয়া প্রশংসা করে; কিন্তু সে রঙ কেমনে আসিল, কোথা হইতে আসিল? কে রঙ ধরাইল? সেটী কেহ তলাইয়া বুঝিতে চায় না—সে দিকে মন দেয় না। ভাই শিবলি! বল দেখি, আমি কি পৃথিবীতে সত্য গোপন করিয়া যাইব? আর সত্য গোপন করিবই বা কেমন করিয়া? সত্য গোপনে যে মহাপাপ! অন্তরে যে ভাব, মুখে যে তাহা ব্যক্ত না করে, সেই কপট কুক্কুরের দয়াময়ের দ্বারস্থ হইবারও অধিকার নাই। আমার অচিরস্থায়ী দেহের পতন হয়, হউক, ক্ষতি কি? তাহার সুখসাধনোদ্দেশে এই পাপে অবিনশ্বর আত্মাকে কলুষিত করিতে আমি সম্মত নহি। আমি কখনই এই সত্য প্রচারে পরাঙ্মুখ হইব না; কাহারও কথা শুনিব না, কোনও প্রতিবন্ধক মানিব না; তাহাতে জগৎ শত্রু হয়, হউক; সমাজপতি যে শাস্তি দিবেন, দিউন; অবনত মস্তকে সহাস্যে সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ বা একটী প্রতিবাদও করিব না। তাই বলিতেছি—

প্রিয় সখে! প্রাণপণে অতি করিয়া যতন
কি আর অধিক বুঝাবে বল;

বুঝিবার যাহা, বুঝিয়াছি তাহা,
তার চেয়ে নাই বুঝিতে বল।

শাস্ত্রমহাসিন্ধু করি আলোড়ন
সহস্র প্রমাণ কর প্রদর্শন,
অশেষ যুকতি, প্রবোধ-ভারতী,
অথবা দেখাও প্রাণের ভয়—
সব অকারণ, বুঝিবে না মন,
কিছুতেই কিছু হবে না ফল।

সুদৃঢ় কঠিন করিয়াছি হিয়া,
পড়ুক অশনি ঘোর গরজিয়া,
অনা'সে লইব এ বুক পাতিয়া,
যাতনা যতই হোক রে তায়—
যথা মহাচল, স্থির অবিচল,
তথা রবে মন চির অটল।

দেখে হাসি পায়, এরা কি অজ্ঞান!
গিরিপাদমূলে করি অবস্থান,
শৃঙ্গবাসী জনে লোষ্ট্র-নিক্ষেপণে,
নীচে নিপাতিত করিতে চায়!!

রবি-শশি-তারা, নামে কিহে ধরা ?
নামে কি ভূতলে জলদদল ?

সাধকের আঁখি করিয়া বিকাশ,
দেখ দেখি চেয়ে তব চারি পাশ !
গ্রহ, উপগ্রহ, শূন্য, গন্ধবহ,
অনল, সলিল, ভূধরচয়—
তিনিময় সব, তিনিময় ভব,
তিনিই বিটপী, তিনিই ফল।

পুষ্পরূপে আহা তিনিই প্রকাশ,
তিনিই অম্বরে বিজলীর হাস,
ঝটিকা-উচ্ছ্বাস, মরুভূর ত্রাস,
তিনিই আঁধার আলোকময়—
প্রকাশ্য গোপন, নব পুরাতন,
আদি অন্ত তিনি মধ্যস্থল।

অলি ছলে তিনি নিজ গুণ গান,
কুলিশে অতুল প্রতাপ জানান,
ভূমির কম্পনে জাগ্রতে চেতনে,
উল্কাপাতে কহে হইবে লয়—

করুণ কঠোর, তিনি সর্ব্বতর,
বুঝেনাক ইহা অবোধদল।

আমি বিভেদ-পরদা ফেলেছি ছিঁড়িয়া,
জানি না কিছুই দ্বিতীয় বলিয়া,
এক আমি সেই,—ভিন্ন কিছু নেই,
নিরখে নিয়ত নয়নদ্বয়,—
ইহ-পরকাল হয়েছে মিশাল,
একাকার ধরা পাতাল-তল।

এক-ই আমি দেখি, দ্বিতীয় দেখি না,
এক বিনা দুই জানিনা মানিনা,
একে আমি ডাকি, একে খুঁজে থাকি,
একেই হৃদয় ডুবিয়া রয়—
ইথে যা তা হবে, সবি প্রাণে সবে,
চাই না শুনিতে ক্রূরের ছল।

সখে! জীর্ণ এ তনু-তরী অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াছি। আর অনুযোগে ফল কি? সমাজের মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে দাও। যদি আমি ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া থাকি, তবে কি এই অকিঞ্চন পাপীকে রক্ষার্থ প্রয়াস পাওয়া অবোধের পরিচায়ক নহে? শীঘ্রই এ দীন মূর্ত্তি নরলোক হইতে অদৃশ্য হওয়া উচিত।

কিন্তু একটী নিবেদন,—আমি সাধারণের নিকট একটী দিনের জন্য অবসর প্রার্থনা করি—একটী দিনের অপেক্ষা করিতে হইবে। আগামী কল্য সিরাজ নগর হইতে এক প্রিয় বন্ধুর এখানে শুভাগমন হইবে। তিনি সমধিক বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভাসম্পন্ন অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক বলিয়াও জগৎপ্রসিদ্ধ। গুপ্ততত্ত্বে তাঁহার অধিকার যথেষ্ট আছে। তিনি জনসমাজে শেখ কবির বলিয়া পরিচিত। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ এবং ক্ষণকাল আত্মবৃত্তান্ত জানাইয়া কথোপকথন করিতে বাসনা করি। আমার এ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইলে তোমাদের অভিলষণীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে আর ক্ষণবিলম্ব সহ্য করিও না।”

বিজ্ঞবর আবুবকর শিব্‌লী ঋষিসত্তম মনসুরের এই সদর্থযুক্ত সতেজ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া নিরুত্তর হইলেন ও তাঁহার জীবন রক্ষায় হতাশ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি মহর্ষির শেষ আবেদন সাধারণ্যে জ্ঞাপন করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর সেই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি প্রদান করিল। কোন কোন গোঁড়ার দল শুভ কার্য্যে বিলম্ব ঘটিল অথবা ভবিষ্যতে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া নাসিকা কুঞ্চনপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মহামান্য খলিফার অনুগ্রহে মনসুরের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এক দিনের জন্য স্থগিত হইয়াছে—আর একটী দিনের জন্য তিনি ইহলোকে অবস্থিতি করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া সমবেত নাগরিকগণের কেহ কেহ গৃহাভিমুখী হইল। কিন্তু অনেকেই উত্তেজনাধিক্য বশতঃ সেই স্বল্প সময়ের জন্য আর বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল না; নগর-বহির্ভাগে সুকোমল মখ্‌মল সদৃশ শ্যামল দূর্ব্বাদল-ক্ষেত্রেই আনন্দ-কোলাহলে যামিনী যাপন করিতে মনস্থ করিল।

কোন কার্য্যের অপেক্ষায় উৎসুক ও উদ্বিগ্নচিত্তে সময়াতিবাহিত করার চেয়ে আর যন্ত্রণা নাই। তখন সময় যেন অতীব দীর্ঘ হইয়া পড়ে, একটী মুহূর্ত্ত একটী যুগ বলিয়া অনুমিত হয়,—সময় কিছুতেই কাটিতে চায় না। প্রান্তরস্থিত নাগরিকগণ আজি এই অবস্থায় অবস্থাপিত। সকলেই চঞ্চল ও অস্থিরচিত্ত, তাহাদের সময় আর কাটিতেছে না। কখন্ প্রভাত হইবে, কখন্ সূর্য্য উঠিবে, কখন্ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কার্য্যে পরিণত হইবে, প্রত্যেকে তাহাই ভাবিতেছে—সেই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কত মনোরঞ্জন উপকথা বলিয়া, কত রঙ্গরস, কত

বৈষয়িক জল্পনা, কত ধর্ম্মালোচনা করিয়া দলে দলে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছে। তথাপি অনাবশ্যক কাল অতীতের গহ্বরে ডুবিতে চাহিতেছে না—ঈপ্সিত কালের দেখা হইতেছে না। কিন্তু কিছুই চিরস্থির নহে। দেখিতে দেখিতে ত্রিযামার যামত্রয় অনন্তের গর্ভে অলক্ষ্যে বিলীন হইয়া গেল। শ্বেতরশ্মি নিশাকর ক্লান্ত কলেবরে পশ্চিম আকাশের দিকে ঢলিয়া পড়িল। ক্রমে কনককান্তি নক্ষত্রকুল আপনাদের জীবনকালের স্বল্পতা উপলব্ধি করিয়া ত্রাসে নিষ্প্রভ ও ব্যথিত হইয়া টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নিশাবসানের পূর্ব্বদূতস্বরূপ মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমসমূহ কলস্বনে দিগ্‌ন্তের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিল। সেই কল-কাকলী সুখ-স্পর্শ পবন-বাহনে আরোহণ করিয়া তর তর বেগে দূর দূরান্তে ছুটিয়া চলিল। সহসা উদয়াচল-চূড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিমিরারি দিনমণি দিব্য কান্তি দেখাইয়া মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে নভস্তলে সমুপস্থিত,—রজনী প্রভাতা হইল। নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে,—তপনের তরল কিরণচ্ছটায় নীলাকাশ মনোরম অনুরঞ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মন্‌সুরের কথিত সেই সুধী পুরুষের আগমন-বার্ত্তা জনতার মধ্য হইতে বিঘোষিত হইল। তিনি প্রান্তরে লোক-সমাগম দর্শনে ও তাহাদের বাক্-

বিতণ্ডা শ্রবণে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন; শেষে হতাশব্যাকুল মনে মনসুরের দিকে শশব্যস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অসহিষ্ণু জনস্রোতও তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

এই সর্ব্বজন-সুপরিচিত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মনসুরের সম্মুখীন হইয়া প্রথমতঃ যথাবিহিত সাদর সম্বোধনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। অনন্তর কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর অনুতাপের সহিত ধীরগম্ভীরে কহিলেন, "সখে! ধর্ম্মাচরণে ও পাণ্ডিত্যে আপনি জগৎপ্রসিদ্ধ। আপনার তুল্য পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান-বিশারদ ব্যক্তি অতি বিরল। কিন্তু বলুন, কি জন্য সেই নিগূঢ় তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া—খনিস্থিত লুক্কায়িত মণির ন্যায় উজ্জ্বল সত্য প্রচারে উদ্যত হইয়া অবিজ্ঞ মূর্খের সদৃশ আপনাকে ভীষণ বিপদে পাতিত করিলেন। আজি আপনি শত্রুপরিবেষ্টিত, জগতের বিচারে অপরাধী। যাঁহারা আপনার আত্মীয়-স্বজন, যাঁহাদের নিকটে আপনি সর্ব্বথা সম্মানিত ও পূজিত ছিলেন, যাঁহাদিগকে আপনি পরম মিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহারাই আজ ধর্ম্মের অনুরোধে—সমাজের প্ররোচনায়, আপনার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত। আপনি একেশ্বর, অসহায় এবং দুর্ব্বল। প্রবলের নিকটে দুর্ব্বলের

পরিণাম যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা ত আপনি বিদিত আছেন? আপনার মহান্ বাক্যের গভীর তাৎপর্য্য সর্ব্বজ্ঞানগরীয়ান্ জ্যোতির্ম্ময় জগদীশ্বর এবং তদীয় অনুগৃহীত সাধক পুরুষ ব্যতীত জগৎ বুঝিতে অশক্ত। যাহা জগৎ বুঝে না, যাহা সাধারণ মানববুদ্ধির অগম্য, তাহা সত্য হইলেও অসত্য, অভ্রান্ত জানিলেও ভ্রান্ত বিশ্বাসে তাহার পরিহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য, মনুষ্য-সমাজে সেই কঠিন জটিল সমস্যার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে নিরস্ত থাকাই সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত। যে তত্ত্ব গুপ্ত, তাহা চিরগুপ্তই থাকুক। লোকে স্বকীয় ধনসম্পত্তির নিরাপদ জন্যই গুপ্তভাবে রাখিয়া থাকে এবং তজ্জন্য সদা শঙ্কিতচিত্তে বাস করে। কিন্তু বলুন দেখি, আপনি কোন্ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া এবং কি জন্য তাহা প্রকাশ করিয়া স্বেচ্ছায় দস্যু-তস্করের কোপদৃষ্টিতে পড়িলেন? আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল অতীত হইতে চলিল, জ্বালাময় অনলরাশি অন্তরে ধারণ করিয়া আপনি অবিচলিতভাবে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন; কখনও আপনার স্বাভাবিক ভাবের পরিবর্ত্তন বা ব্যত্যয় ঘটিতে দেখি নাই। কখনও আপনার সাধক-জনোচিত সহিষ্ণুতার লাঘব হইতে শুনি নাই। কিন্তু হায়! সংপ্রতি এ কি অজ্ঞানান্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়া বসিয়াছেন? এই

অসহিষ্ণুতার—উন্মত্ততার কারণ কি? যাহা এত দিন অন্তরে রাখিয়াছিলেন, তাহা অন্তরেই পোষণ করিয়া রাখা কি উচিত ছিল না? এক্ষণে অধিক আর কিছু বলিবার সময় নাই, স্থিরচিত্তে আমার কথা শ্রবণ করুন। যে উক্তি লোকের শ্রবণকঠোর বোধ হয়, সমাজ যাহাতে অধর্ম্ম বিবেচনা করেন, যাহার প্রশ্রয় দিতে বাল-বৃদ্ধ কেহই সম্মত নহেন, আপনি এরূপ উক্তির উচ্চারণে ক্ষান্ত থাকিয়া আপনাকে বিপন্মুক্ত করুন, ইহাই আমার অনুরোধ।”

মনসুর আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষণকাল নীরব থাকিলেন। পরে মৃদুস্বরে কহিলেন, “যদি মূর্খতাই না করিব, যদি আমার ধৃষ্টতাই না হইবে, তবে আজ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইব কি জন্য? নরচক্ষে—নরের বিচারে অপরাধ করিয়াছি বলিয়াই ত আমি অপরাধী! নতুবা নিরপরাধের কেশ-স্পর্শ করে কাহার সাধ্য? কিন্তু জানিবেন, ইহা বিধি-লিপি! সর্ব্বজ্ঞ বিধাতাপুরুষ অদৃশ্য অক্ষরে ললাট-ফলকে যে সমস্ত ভাবী ঘটনার উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন, জীবনে তাহা ঘটিবেই ঘটিবে—কিছুতেই খণ্ডিত হইবার নহে। সুতরাং আমি স্বয়ং সাধ করিয়া যে আত্মনাশে উদ্যত হই নাই, ইহা স্থিরনিশ্চয়। ইহা সেই বিধাতারই কার্য্য।

মনুষ্যের কি স্বাধীন ইচ্ছা আছে? আপনি ত সমস্তই অবগত আছেন এবং আমার বর্ত্তমান আন্তরিক ভাবও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। আমি অপার জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডবৎ অতি প্রবল তরঙ্গমালায় দোদুল্যমান। ইচ্ছা, স্থির থাকিব, কিন্তু থাকিতে পারি কই? সে শক্তি আমার কোথায়? মুহূর্ত্ত মধ্যে চলোর্ম্মি প্রভাবে আমার অসংখ্যবার উর্দ্ধাধোভাবে উত্থান-পতন হইতেছে। সুতরাং অনর্গল মুখদ্বার দিয়া অন্তরের বদ্ধমূল কথা উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বতঃই বাহির হইয়া পড়িতেছে। তাহা রুদ্ধ করিতে আমার সামর্থ্য নাই,—প্রবৃত্তিও হয় না। অতএব যে কারণেই হউক, আমি প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত পাত্র। আহা-হা কি আনন্দ! কি সুখদর্শন!! আজ সমুদয়ই আলোকময় দেখিতেছি—আকাশ-পাতাল-ভরা আলোক—একই প্রকার আলোক, দ্বিতীয় আলোক নাই। কি আশ্চর্য্য! কি মনোরম দৃশ্য এ! এমন ঔজ্জ্বল্য-লহরী-লীলা ত কখন দেখি নাই!! নয়ন সার্থক হইল, হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। হে জ্ঞানময়! হে সর্ব্বনিয়ন্তা! বিলম্বে প্রয়োজন কি? বোগদাদাধিপতির—বোগদাদবাসিগণের এবং তৎসহ আমার মনস্কামনা শীঘ্র পূর্ণ হউক। আর আপনি হে হিতৈষী সখে! যদি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ জিজ্ঞাসা করেন, তবে বিনা চিন্তায়

'শরিয়তে'র বিধানানুসারে আপনিও ইহার ব্যবস্থা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।"

সুবিজ্ঞ শেখ কবির, মহর্ষি মনসুরের এতদ্বাক্য শ্রবণে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিষম মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাই অবশেষে মৃদুস্বরে কহিলেন, "ভাই! আপনার কথা সমস্তই সত্য। উহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, কার্য্যটী কি মর্ম্মভেদী! কি লোমহর্ষণ!! এমত সঙ্কটস্থলে আমাকে ব্যবস্থা লেখা কি সম্ভব হইতে পারে?" মনসুর উচ্চ স্বরে কহিলেন, "পারে —পারে—অবশ্যই পারে? 'শরিয়তের' বিধানকে প্রতারণা করা আমার বাসনা নহে—আপনারও হইতে পারে না। শাস্ত্রমতে যখন আমি শূলাগ্রে বধার্হ প্রশস্ত, তখন তাহাতে নীরবতা অবলম্বন করিয়া স্বীয় দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমার অনুরোধ, আপনি ব্যবস্থা দিতে ইতস্ততঃ করিবেন না।"

এইরূপ বহুবিধ কথোপকথন হইল। সেই কথোপকথনের ঘাত-প্রতিঘাতে উভয়ের মুখ হইতে কত নৈতিক উপদেশ, কত গূঢ় তত্ত্ব-কথা, কত প্রিয় প্রসঙ্গ বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু অল্পবুদ্ধি জনমণ্ডলীর তাহা বুঝিবার

হৃদয় কোথায় ? কিন্তু যে বুঝিল, সে মৃতবৎ দণ্ডায়মান হইয়া অবিরল অশ্রুধারে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল, তাঁহার অন্তর নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল। ব্যথিত-প্রাণ মহাত্মা কবির নীরব—আর অপেক্ষা করিলেন না ; জনতা ভেদ করিয়া মন্‌সুরের নিকট হইতে ম্লানমুখে বহির্ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

সহৃদয় শেখ কবিরের সহিত মহর্ষির বাক্যালাপ সাঙ্গ হইলে, চতুর্দ্দিকস্থ মানবমণ্ডলী কোলাহল করিয়া উঠিল। অনেকে মনসুরের কথিত মতে ব্যবস্থাপ্রার্থী হইয়া আগন্তুক শেখ সাহেবকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই মহামনস্বী পুরুষ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিলেন। তাঁহার অন্তরমধ্যে নানা চিন্তার আবির্ভাব হইল। অনন্তর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "হে বোগদাদের ইস্‌লাম-সন্তানগণ! দৃঢ়ব্রত মনসুরের সহিত যে সমস্ত কথা হইল, তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহার গুপ্তাবস্থা—আন্তরিক ভাব সেই সর্ব্বজ্ঞ বিশ্ব-বিধাতাই অবগত আছেন। তাহাতে তিনি অপরাধী কি না, তাহা তিনিই জানেন। তবে প্রকাশ্য অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিলে তিনি যে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপ-রাধী, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুপবিত্র 'শরার' বিচারে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। কিন্তু তজ্জন্য এত উতলা—এত ব্যাকুল কেন? যিনি খোদার পথে স্বয়ং আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, তাঁহার প্রতিকূলে ব্যবস্থার আবার প্রয়োজন কি বল দেখি?

বিচারপতি কাজীই বা তাঁহার কি বিচার করিবেন? তিনি ত আপনার বিচার আপনিই করিয়া রাখিয়াছেন! আপনারা যাহা চাহিতেছেন,—তিনিও তাহাই চাহিতেছেন, এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।”

এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তুষ্ট ও শান্ত হইল। কিন্তু ইত্যবসরে অনেকগুলি নিষ্ঠুর ও উদ্ধতপ্রকৃতির লোক বিলম্বজনিত বিরক্তিতে ব্যস্ত হইয়া প্রহরীদের দ্বারা মহর্ষিকে বধ্যস্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল। অহো! সেই সময়ে সেই শুভ্রকর্ম্মা পুরুষের পবিত্র ও কোমল অঙ্গে কত ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত নির্দ্দয় রাক্ষসের কুলিশোপম কঠোর হস্ত পতিত হইল। কেহ কেহ আরক্ত নয়নে তদাচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল! আবার মহা কোলাহল—আবার মহা ধুম পড়িয়া গেল। সকলেরই দৃষ্টি সেই একই কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইল। সম্মুখে, পার্শ্বে, পশ্চাতে, অন্তরে, অদূরে, সর্ব্বত্রই একটী অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি হইল। অহো! সে দিনের সেই ভীষণ দৃশ্যের—সেই ভয়াবহ ঘটনার বর্ণনা করিয়া উঠে, কাহার সাধ্য? প্রান্তরের চতুর্দ্দিকেই যেন প্রলয়-তুফান বহিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকেই সংখ্যাতীত লোকের সমাবেশ। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় বধ্যভূমি লক্ষ্যে সুবিশাল বোগদাদ নগরবাসীদের দ্রুত গমনের বিরাম নাই; জনকোলাহলে আকাশমার্গ গম্ গম্

করিতে লাগিল। কাহারও মুখে শোকসূচক হাহাকার-ধ্বনি, কেহ বা আনন্দ প্রকাশে নিরত হইল।

"আজ প্রণয়-পরীক্ষার দিন! প্রেমিক স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া প্রণয়পাত্রের সম্মুখীন হইতেছেন,—বিচ্ছেদের বিষাদময়ী রজনীর অবসানে সুখময় মিলন-প্রভাত সমুপস্থিত হইতেছে। প্রেমিক ও প্রণয়াস্পদ নিয়ত নির্ভয়ে প্রণয়ার্ণবে নিমগ্ন থাকিবেন, আজ তাহার সূচনা হইতেছে। বিরহের বিষম চিন্তা আজ চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। বহু দিন হইতে যে হৃদয় শূন্য ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইতে চলিল। দগ্ধ ক্ষতে শান্তিসুধার বর্ষণ হইতেছে। আজ ঈশ্বরের কৃপায় সাধকের চিরাভিলাষ সিদ্ধ হইতেছে।" এবম্প্রকার বহু বাক্যে যাবতীয় লোক,—কেহ স্বভাবে, কেহ বা রহস্য ও অসূয়াপরবশ হইয়া পরিহাস-প্রকাশক কণ্ঠে যাহার মুখে যাহা আসিল, সে তাহাই কহিতে লাগিল। কিন্তু দৃশ্যটী কি লোমহর্ষণ! ঘটনাটী কি নৃশংস!! কার্য্যটী কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী বেদনা-ব্যঞ্জক!! সে দিকে কাহার দৃষ্টি নাই; কার্য্যের গভীরতা পরিমাণ করিতে ও পরিণাম চিন্তা করিতে সকলেই অক্ষম। হা বিধাতঃ! হে প্রেমময় পরাৎপর প্রভু! প্রেমের কি পরিণাম এই? প্রেমিকের পুরস্কার কি এই-রূপেই হইয়া থাকে? হে বিশ্বপ্রেমিক! তোমার সহিত

প্রণয়-বন্ধনে প্রণয়িকুল আবহমান কাল সুখ-শান্তিতে অবস্থান না করিলেও লোকের ভক্তি, প্রীতি ও সম্মান লাভ করিয়াই আসিয়াছেন; কিন্তু কাহাকে কবে অরাতিকরে এ হেন নিষ্ঠুর রূপে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে? আজের এ ঘটনা নিখিল ধরণীধামে অভিনব, অলৌকিক, অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব।* ধন্য মহর্ষি মনসুর! ধন্য তুমি অকৃত্রিম প্রেমিক! ধন্য তুমি সাধনসহিষ্ণু ধর্ম্মবীর! ধন্য তোমার তত্ত্বজ্ঞানজনিত বৈরাগ্য! আজ তোমার বিচ্ছেদানল—হৃদয়ের সন্তাপানল নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, পীড়ার উপশম হইতে আর বিলম্ব নাই। ত্বরায় প্রিয় সহ প্রিয় সম্ভাষণে সম্মিলিত হইবে। হীনবুদ্ধি লোকেরা ভাবিতেছে, তুমি ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করিতে এখানে আনীত হইয়াছ। কিন্তু তোমার মনে ত সে ভাবের লেশমাত্র নাই! তুমি ভাবিতেছ, তোমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক হইতেছে; দুঃখময়ী অমানিশার অবসান হইতেছে। কখন্ সর্ব্বভুবন-প্রকাশক দিনমণির শুভ্রালোকে চরাচর উদ্ভাসিত

* মহাত্মা যীশুখৃষ্ট (হজরত ইসা) শত্রুকর্ত্তৃক শূলে আরোপিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই, তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন, ইহাই অনেক ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞের অভিমত। কিন্তু খৃষ্টিয়ানদিগের মতে যীশুখৃষ্টের শূলে আরোপিত হইবার ঘটনা যদি সত্য বলিয়াও ধরা যায়, তবে তাহাও এরূপ অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উদাহরণ বা এরূপ অকৃত্রিম প্রেম-প্রকাশক নহে।

হইবে, তুমি সেই আশায় শুষ্ককণ্ঠ চাতকের ন্যায় সময় গণনা করিতেছ। বদনে চিন্তার ছায়াপাত মাত্র নাই, চিত্ত বিকাররহিত—প্রফুল্ল। মরি মরি কি মধুর! কি অলৌকিক!! কি অভাবনীয় অমায়িক ভাব!! মহর্ষে! এ জগতে তুমিই তোমার একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল।

লোকারণ্যের মধ্যস্থলে উচ্চশির শালবৃক্ষসদৃশ মস্তক উন্নত করিয়া—অগণিত অজ মধ্যে মহাবল শার্দ্দূল সম সাহসে স্ফীত হইয়া মহামনস্বী মনসুর অনন্যমনে দণ্ডায়মান,—অন্তরে উদ্বেগের চিহ্ন নাই, মুখে বচন নাই—নির্ভয়, নিস্পন্দ ও নীরব। ভয় করিবেন কাহার? সাগর কি শিশিরের ভয় করে? মাতঙ্গের মনে কখন কি পতঙ্গের শঙ্কা জন্মে? আহা! মহর্ষির সে সময়ের ভাব অতি মধুর, অতি গম্ভীর ও প্রফুল্লতাব্যঞ্জক। তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে যেন বিদ্যুচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে, শান্তোজ্জ্বল নেত্রদ্বয় কি এক মধুর ভাবে বিভোর হইয়াছে। সংখ্যাতীত নরচক্ষু সেই ভাবময় পুরুষের প্রতি তীব্র লক্ষ্যে অপলকে চাহিয়া রহিয়াছে! কিন্তু সহসা কি এ অত্যদ্ভুত ঘটনা! ইহা ঐন্দ্রজালিকের মোহকরী যাদুবিদ্যা হইতেও বিস্ময়জনক ও চমকপ্রদ। অকস্মাৎ জলদ-নির্ঘোষে "হক্ হক্—আনাল্ হক্" শব্দ সাধারণের শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল; পরমুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখে,

মন্‌সুর নাই। এই ছিল, এই নাই। প্রাণান্তক যমদূত সমকক্ষ প্রহরিগণ-পরিবেষ্টিত বন্দী তপস্বী, শত শত নর-নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না। সকলেই যথাস্থানে একই অবস্থায় দণ্ডায়মান, পিপীলিকা-প্রবেশেরও পথ নাই, বাতাস নিঃসারিত হয় এমন ছিদ্র নাই; তবে মন্‌সুর কোন্ শক্তিপ্রভাবে কেমন করিয়া কোন্ পথে পলায়ন করিলেন? বিদ্যুৎস্ফুরণ-কার্য্য সম্পাদিত হইতে যতটুকু সময় লাগে, তদপেক্ষাও স্বল্প সময়ের মধ্যে, মুখের কথা মুখে বিলীন হইতে না হইতে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে এ কি ঘোর পরিবর্ত্তন! ইহা কি ভৌতিক ঘটনা? কে বলিতে পারে, ইহা ভৌতিক ঘটনা! ফলতঃ সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রসনা নীরস, মুখ মলিন, হৃদয় উৎসাহহীন, শরীরে বল নাই। জন-সাধারণ যেন গতিশক্তিহীন প্রস্তরখোদিত প্রতিমাবৎ অবশ ও অচল। কে যেন অকস্মাৎ নয়নে ধাঁধা লাগাইয়া দিল; আনুপূর্ব্বিক তাবৎ ঘটনা স্বপ্নময়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর প্রান্তর কিছুক্ষণ নীরব নিস্তব্ধ; আবার ভয়ানক কোলাহল সমুত্থিত হইল, সকলেই নানাপ্রকার

বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইল। মনৃস্থরের ক্ষমতা অদ্ভুত, এ ক্ষমতা সাধনা-সম্ভূত, বিস্ময়ের একশেষ এ দৃশ্য ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া অনেকে তাঁহার প্রশংসা-গান করিল। নিরীহ ধর্ম্মসেবকেরা "হা আল্লা! তুমিই মহান্" বলিয়া প্রসন্নমনে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিলেন। কিন্তু মনৃস্থর-বিদ্বেষিদলের মুখ রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায় ও অপমানে অবনত। "ধৃত ব্যাঘ্র পলায়ন করিয়াছে, হায় ধর্ম্মাব-মাননার বুঝি আর প্রতীকার হয় না" চঞ্চলমতি গোঁড়ার দল ইহাই ভাবিয়া আকুল ও রোষান্বিত হইল!

অনন্তর কি কৌশল করিলে মনৃস্থরকে পুনরানয়ন করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল! কিন্তু কেহই ভাবিয়া কোন সূক্ষ্ম উপায় বাহির করিতে পারিল না। তখন প্রধান পক্ষীয়েরা পরামর্শ করিলেন, "মনৃস্থরের প্রতি কটূক্তি ও তৎপক্ষাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করিলে, নিশ্চয় তাঁহার পুনর্দর্শন পাওয়া যাইতে পারিবে। তিনি এই স্থানে আমাদের মধ্যেই আছেন, কিন্তু আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ নয়ন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না; ফলতঃ এ কার্য্য করিলে তিনি কিছুতেই আর অন্তরালে থাকিতে পারিবেন না।" এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, তাঁহারা সমবেত জন-মণ্ডলীকে উত্তেজিত করিলেন। তাহাতে দুর্দ্দান্তস্বভাব

অর্ব্বাচীনেরা আঘাত-প্রাপ্ত বিষধরের ন্যায় ক্রোধে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া ঋষিরাজকে অকথ্য কটূক্তি করিতে লাগিল এবং তৎপক্ষসমর্থনকারী ও তাঁহার সহমতাবলম্বী সাধুদিগকে বিকৃতস্বরে পরিহাস ও বাক্যবাণ বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতেও সফলকাম না হওয়ায়, পরস্পর ইঙ্গিতানুসারে সকলে সজোরে প্রস্তরাঘাতপূর্ব্বক সেই নিরীহ ব্যক্তিগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত, বিড়ম্বনার একশেষ হইল; অবিচার-উৎপীড়ন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। মার-ধরসূচক হুহুঙ্কার নাদে যেন প্রবল বাত্যার সৃষ্টি হইল।

এদিকে অদৃশ্য যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া এই বীভৎস কাণ্ড দর্শনে তপঃসিদ্ধ মন্সুর আর সহ্য করিতে পারিলেন না। একের পরিবর্ত্তে অপরের নিগ্রহ, অপমান ও দণ্ডভোগ! ইহা প্রকৃতই ন্যায়বিরুদ্ধ,—তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি তদ্দণ্ডে প্রেমপূর্ণ 'আনাল হক্' শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া,—অত্যাচারী জনগণের অন্তর কাঁপাইয়া আবার সকলের দৃষ্টিসীমার মধ্যে উপস্থিত হইলেন। অমনি সেই নির্লজ্জ ক্রূরকর্ম্মাগণ সক্রোধে তাঁহার উপর প্রস্তর বর্ষণে রত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি ত্বরিতপদে শূলাস্ত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বর্ষার বারিপাতের ন্যায় মহর্ষির

উপর আরও অজস্র প্রস্তর পতিত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সাংঘাতিক আঘাতেও কোন দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, সাধনসহিষ্ণুতার ফলে মনের ভাব পূর্ব্ববৎ অটল, তুষ্টিজনক ও বিকাররহিত। বিষাদের কালিমা-রেখার পরিবর্ত্তে হাস্যের আনন্দলহরী তাঁহার বদন-মণ্ডলে পরিদৃশ্যমান। কেননা শত্রুনিক্ষিপ্ত সেই কঠিন প্রস্তরখণ্ডসমূহ তাঁহার কোমলাঙ্গে প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া মৃদুভাবে পড়িতেছিল এবং তজ্জনিত আঘাত তিনি সুকোমল কুসুমস্পর্শ তুল্য সুখদ জ্ঞান করিতেছিলেন।

এই সময়ে আর একটী বিস্ময়জনক ঘটনা সংঘটিত হইল। মহর্ষির প্রিয় সখা শেখ শিব্‌লী তাঁহার উপরে একটী পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। সেই পুষ্পাঘাতে তিনি মর্ম্মান্তিক কাতরতা প্রদর্শন করিলেন। প্রস্তারাঘাতে আনন্দ এবং পুষ্পাঘাতে যাতনা! প্রকৃতই ইহা বিস্ময়ের কথা বটে!! ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে মহর্ষি সহর্ষে বলিলেন, "জানিও ধর্ম্ম-মর্ম্মানভিজ্ঞ অপ্রেমিক অত্যাচারীর প্রহার হইতে আমি বিমুক্ত—স্বাধীন। অন্ধের লক্ষ্য কখন কি ঠিক হইতে পারে? কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির সন্ধান অব্যর্থ ও মারাত্মক। আমার সেই চিরারাধ্য প্রেমময় বন্ধুর প্রেমিক যিনি, যাঁহার সহিত

আমার অন্তরের নিকট সম্বন্ধ, যিনি আমার ব্যথার ব্যথী, তিনি তৃণাঘাত করিলেও কষ্টানুভব হইয়া থাকে।” পুনঃ প্রশ্ন হইল। শিব্‌লী বলিলেন, “হে প্রিয়ম্বদ প্রিয়বর! ‘প্রেম’ শব্দটী সর্ব্বত্রই শুনিতে পাইয়া থাকি, কিন্তু প্রেমের প্রকৃত অর্থ কি, কেহই জানে না। আপনাকে সাধারণ্যে তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।” মহর্ষি মৃদুহাস্যে কহিলেন, “প্রিয়বন্ধু শিব্‌লী! প্রেমের ব্যাখ্যা আপনি কি বুঝিতে পারেন নাই? তবে শুনুন, প্রেমের প্রকৃত অর্থ—হত্যা ও সর্ব্বসমক্ষে প্রেমিকের শব-দাহ করণ। শীঘ্রই এ ঘটনা দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন।” আবার প্রশ্ন হইল, “আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অর্থ কি?” এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি মৃদুভাষে কহিলেন,—“ইহার অর্থ অতি সামান্য, অতি সূক্ষ্ম, রেণুকণা সদৃশ। যাহা বুঝিয়াছেন, সে সমস্ত অলীক চিন্তামাত্র।” এইরূপ ধীরচিত্তে মহাজ্ঞানী মনসুর বহু লোকের বহু প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিলেন।

অবশেষে তেজস্বী ধর্ম্মবীর প্রসন্নবদনে শূলীদণ্ডের নিকট গমন করিলেন। তখন উজির জল্লাদকে মহর্ষির পবিত্র অঙ্গে হাজার ‘কোড়া’ মারিতে অনুমতি করিলেন। যদি তাহাতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, উত্তম, নতুবা তদুপরি আবার সহস্র ‘কোড়া’-প্রহারের .ব্যবস্থা

করিলেন। কেননা তাহাই খলিফার আদেশ। এই আজ্ঞানুসারে নিষ্ঠুর জল্লাদ উগ্রমূর্ত্তিতে কঠিন কোড়া-দণ্ড হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইল। "অহহ! কি করিস্—কি করিস্, রে বর্ব্বর থাম্ থাম্, এ কি করিতে যাইতে-ছিস্,—কোড়া সম্বরণ কর্।" জল্লাদের হৃদয়ের ভিতরে সহসা কে যেন এই নিষেধ-ধ্বনি উত্থিত করিল—তাহার প্রাণ কাঁপিল। কিন্তু সে নিষেধ মানিয়া সে কি নিরস্ত হইতে পারে? উজিরের ইঙ্গিতক্রমে জল্লাদ তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র কোমল অঙ্গে—অহো সেই সুদুর্লভ রক্ত-মজ্জা-মাংস-গঠিত শোভন অঙ্গে কাঁপিতে কাঁপিতে উপর্য্যু-পরি প্রহার করিতে লাগিল। এক—দুই—তিন, এক শত—দুই শত—তিন শত, হাজার—দুই হাজার এক এক করিয়া ক্রমে সমস্ত আঘাতই ফুরাইয়া গেল। সহস্র সহস্র মানব সেই ভীষণদর্শন দৃশ্য দর্শন জন্য নির্নিমেষনেত্রে দণ্ডায়মান। কিন্তু সঙ্কল্প নিষ্ফল, সমস্তই বৃথা! মহর্ষি অবিচলিতচিত্ত!! তাঁহার গাত্রচর্ম্ম ফুটিয়া রক্ত বিচ্ছুরিত হইল বটে,—সর্ব্বাঙ্গ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বেদনাব্যঞ্জক ভাব কোথায়? সে বদনমণ্ডল অম্লান—উৎফুল্ল, অন্তর কাতরতার লেশ-শূন্য! ইহা দেখিয়া দুরন্ত লোকেরা ক্রোধে স্ফীত হইয়া আবার তাঁহাকে পাথর ছুড়িয়া মারিতে আরম্ভ

করিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলেন না, সেই শিলা-বৃষ্টির মধ্য দিয়া শূলীদণ্ড চুম্বনপূর্ব্বক স্বয়ং বধ-মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখনও প্রস্তর-পতনের বিরাম নাই, তখনও নিষ্ঠুরদের ক্রোধের উপশম হয় নাই! কিন্তু সকলেই তাঁহার অবিচলিত ধৈর্য্যশীলতা ও দৃঢ়হৃদয়তা দেখিয়া আরও চমৎকৃত হইল। আর যাঁহারা ভাবগ্রাহী ধর্ম্মভীরু, তাঁহাদের অন্তর চূর্ণ হইয়া গেল,—নয়নে দর দরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অনন্তর মহাতপা মনসুর জগৎপাতার উদ্দেশে ঊর্দ্ধমুখে হস্তোত্তোলন করিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে "হক্ হক্—আনাল্ হক্" শব্দোচ্চারণে দিক্ দশ বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। কি আশ্চর্য্য! কি অলৌকিক ঘটনা! বিধাতার কি অননুভূত বিচিত্র লীলা!! যে শব্দের উচ্চারণে বোগ্দাদের জনসাধারণ মনসুরের প্রাণহন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এক্ষণে সেই নিষিদ্ধ 'আনাল হক্' শব্দ তাহাদের রসনা হইতে অনিবার্য্যরূপে অনর্গল নিঃসারিত হইতে লাগিল। কে যেন সজোরে তাহাদের রসনা-যন্ত্র ঘূর্ণিত করিয়া সেই ধ্বনি বাহির করিতে লাগিলেন। কেহই নিস্তব্ধ নহে, সকলে এই একই ধূয়ায় উন্মত্ত। কেবল যে নর-মুখে এই ধ্বনি, তাহা নহে, নিজ্জীব জড়পদার্থ এবং

উদ্ভিজ্জাদিও ঐ ধ্বনি বহির্গমনে ক্ষান্ত রহিল না। মানবমণ্ডলীর মুখে আনাল্ হক্, পদদলিত দুর্ব্বাদলে আনাল্ হক্, ইষ্টক্-প্রস্তর-মৃৎখণ্ডে আনাল্ হক্, তরু-লতা-গুল্মে আনাল্ হক্, অলক্ষ্য বায়ুসাগরে আনাল্ হক্, উড্ডীয়মান মেঘমালায় আনাল্ হক্, পশু-পক্ষি-কীট-মুখে আনাল্ হক্, এইরূপ যে দিকেই দেখা যায়, যে দিকেই কর্ণপাত করা যায়, সেই দিকস্থ স্থাবরজঙ্গম যাবতীয় পদার্থেই উক্ত একবিধ শব্দের মুহুর্মুহু বিনির্গমন শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। আহা! এতদপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়—অমানুষিক অপূর্ব্ব ঘটনা আর কি হইতে পারে? আরও আশ্চর্য্য এই যে, যাহারা বিরুদ্ধপক্ষ, তাহাদিগকেও আজ অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে আসিয়া জড়-অজড় পদার্থনিচয়ের সহিত সেই একবিধ দোষেই দোষী প্রমাণিত হইতে হইল। ইহা দৈবের কৌশল, না বিড়ম্বনা? না ভক্তের মাহাত্ম্য-শক্তির এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন? কে ইহার সদুত্তর দিবেন!

বিপক্ষদল এই দৈবনির্ব্বন্ধে বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত ও নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া অধৈর্য্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে জল্লাদকে কহিল, "আর বৃথা বিলম্বের প্রয়োজন কি? আর বিড়ম্বনাভোগ কি জন্য? উহার প্রাণবায়ু যত শীঘ্র

দেহ-বাস শূন্য করিয়া অনন্ত বায়ু-সাগরে বিলীন হয়, ততই মঙ্গল, তুমি তাহারই আয়োজন কর জল্লাদ। ইহার সর্ব্বাবয়ব সুতীক্ষ্ণ অসি-প্রহারে শতধা বিচ্ছিন্ন করিতে—অস্থি-সন্ধি পৃথক ও চূর্ণ করিতে আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা করিও না।”

উঃ কি লোমহর্ষণ কথা! বজ্রলেপহৃদয় নির্ম্মমগণের কি নিষ্ঠুরাদেশ!! কি অমানুষিক পৈশাচিক অত্যাচার!! শুনিলেও অন্তরাত্মা উড়িয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে, শোণিত বিশুষ্ক হয়, নিতান্ত পাষাণহৃদয়ও দয়ার্দ্র হইয়া থাকে। আহা তৎকালে তথায় কি কেহই ছিল না,—মহর্ষির মহিমা বুঝিতে—গূঢ় উক্তির মর্ম্মগ্রহ করিতে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ,—নৃশংস হত্যার কবল হইতে ধার্ম্মিককে রক্ষা করিতে প্রকৃত নরশার্দ্দূল কেহই কি বিদ্যমান ছিল না? বড়ই ক্ষোভের কথা! বড়ই পরিতাপের বিষয়!! লেখনি! ভস্মীভূত হও, মস্যাধারে মসী বিশুষ্ক হউক। হস্ত! আজ অচল হও, এই দুর্ব্বিষহ শোকের কাহিনী বর্ণনা করিতে আর অগ্রসর হইও না। বিধাতঃ! এই কি তোমার ভক্তগত প্রাণ? এই কি তোমার অনুগতের কুশল সাধন? এই কি তোমার বন্ধুত্বের প্রতিদান? ক্ষুদ্র নর আমি, বুঝিতে পারিলাম না প্রভো! এ তোমার কেমন কৌতুকাবহ লীলাখেলা!

প্রিয় পাঠক! আসুন—একবার মনশ্চক্ষে নিরীক্ষণ করুন, কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! ঐ দেখুন, অজ্ঞানান্ধদের আজ্ঞাক্রমে কালান্তক্ যমদূতস্বরূপ নির্দ্দয় ঘাতকের বিজলীবিনিন্দিত চাক্‌চিক্যশালী খরশাণ তরবারি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। মহর্ষি তন্নিম্নে মস্তক. অবনত করিয়া ঘাতককে বিনীতভাবে কহিলেন, "ভাই জল্লাদ, শীঘ্র স্বীয় কার্য্য সম্পাদন কর। শীঘ্র এই মহাপাপীর—এই ঘোর অপরাধীর দণ্ড প্রদান কর। আমার অন্তর অহোরজনী দগ্ধ হইতেছে। যদি দেখাইবার হইত, তবে আজ এই সমবেত বন্ধুদিগকে দেখাইতাম—জগৎকে দেখাইতাম, দেখিয়া বুঝিত। আমার হৃদয়ে সুখ নাই,—মনে শান্তি নাই, অন্তর শূন্য—অনলপূর্ণ—তুফানময়! তুমি আজ সেই জ্বলন্ত আগুন নিবাইয়া দিয়া বন্ধুর কার্য্য কর!"

মহর্ষির বিনীত বচন শ্রবণমাত্র নিষ্ঠুর ঘাতক অসিপ্রহারে তাঁহার সুপবিত্র দেহ হইতে হস্তদ্বয় বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। অমনি দুই বাহুমূল হইতে পবিত্র শোণিত-প্রস্রবণ দ্রুত উচ্ছ্বসিত হইয়া সুদূর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্ত-রঞ্জিত হইল, রক্তপ্রবাহে ধরাতল কর্দ্দমাক্ত হইয়া গেল। অহহ কি নৃশংস ব্যাপার! কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য!! কি ভীষণ নিষ্ঠুর কাণ্ড!! অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে

বজ্রাঘাত হইল। তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বিলাপসূচক করুণ কাতরোক্তি অলক্ষ্যে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। প্রকৃতির হাস্যভরা বদনমণ্ডলে যেন বিষাদের বিষম কালিমা-কুজ্ ঝটিকার সঞ্চার হইল। বিশ্বসংসার অন্ধকার ময়! শ্মশানবৎ শন্ শন্ করিতে লাগিল। অহো, তৎকালে এই অবিচার-অত্যাচারের লীলাস্থলী বসুমতী ঘন ঘন বিকম্পিত ও রসাতল-তল-সাগরে বিপর্য্যস্ত না হইয়া, সেই পাপস্মৃতি এখন পর্য্যন্ত হৃদয়ে ধরিয়া আছে কেন, কেমনে বলিব? বিধাতার চক্র, বিধাতাই জানেন!

সহৃদয় পাঠক! বিদূষী পাঠিকে! করুণাময় জগদীশ্বরের অনুগ্রহে কথায় কথায়, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে এত দূর পর্য্যন্ত আসিলাম। কিন্তু আর পারি না—এক্ষণে মহাবিপদ—ঘোর সঙ্কট! কি সঙ্কট? তাহা কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? যাহার আংশিক অবতারণায় আপনারা শোকে ক্ষোভে ম্রিয়মাণ—মর্ম্মবেদনায় সংজ্ঞাশূন্য,—অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না, সে বিপদের কথা কি এখনও বলিয়া দিতে হইবে? এমন মর্ম্মভেদী ভয়াবহ ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, কাহার নিকটে শুনেও নাই, জগতে আর কখন ঘটিয়াছে কি না, তাহাতেও ঘোর সন্দেহ আছে। হায় কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ভাবিয়া মস্তক

ঘুরিয়া যাইতেছে, কল্পনার উদ্ভাবনীশক্তি তিরোহিত হইয়াছে, হস্ত শিথিল ও রসনা অবশ, করধৃত লেখনীও কম্পিত। সুতরাং আর কি বর্ণনা করিব? বর্ণনা করিবার শক্তি কোথায়? তাই বলিতেছি পাঠক! আজ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি। জানিয়া শুনিয়া—ইচ্ছা করিয়া এমন কঠিন কার্য্যে কি প্রবৃত্ত হইতে আছে? কিন্তু কি করিব, হাত নাই, যে ঔষধ গুলিয়াছি, তাহা গিলিতেই হইবে।

মহর্ষির সুপবিত্র বাহুদ্বয় ভূপতিত হইয়া রুধিরাক্ত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই সত্ত্ব-গুণের অবতার সাধকপ্রবর ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বিশ্ব-বিধাতার গুণানুকীর্ত্তনপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ হৃষ্টমনে প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে কহিলেন,—“মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টির দৃশ্য আমার স্থূল হস্ত কর্ত্তিত হইল, কিন্তু যে হস্ত নরদৃষ্টির বহির্ভূত, আমার সেই অদৃশ্য সূক্ষ্ম হস্ত কাটিতে এ জগতে কাহারও ক্ষমতা নাই।” এই উক্তির পরেই শোণিতার্দ্র বাহুমূলে আপনার মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিলেন, মুখশ্রী রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইল। তখন শেখ শিব্‌লী ভগ্নহৃদয়ে কাতরকণ্ঠে তাহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি কহিলেন, “আমি সেই পরাৎপর পরম বন্ধুর প্রিয় কার্য্য ‘নামাজ’ নির্ব্বাহ করিব বলিয়া ‘অজু’ করিতেছি,

পার্থিব জীবনের শেষ সাধ মিটাইয়া লইতেছি। ভাই! আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না, জানিবেন, প্রেমের জন্য প্রেমিক আপনার জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে,—যথার্থ বন্ধুত্বপ্রয়াসী যিনি, তিনি বন্ধুর প্রীতি-সম্পাদনার্থ সকলই করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে জলের পরিবর্ত্তে স্বীয় শরীরনিঃসৃত তপ্ত রক্তে 'অজু' করাই প্রশস্ত ও গৌরবের বিষয়। যে ব্যক্তি হৃদয়ের রক্ত দ্বারা 'অজু'-ক্রিয়া সমাধা না করে, তাহার 'নামাজ' সিদ্ধ নহে, সে প্রেমাস্পদের নিকট সম্মানিত নহে। তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত পরমপদ লাভে বঞ্চিত হওয়াও অসম্ভব নহে।" মহর্ষির এই বাক্য অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদযুগল কর্ত্তিত হইল। অমনি তিনি মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "বোগদাদবাসিগণ! হে ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তিবৃন্দ! এ পদ পার্থিব,—নশ্বর পার্থিব পদ কর্ত্তন করা কঠিন কার্য্য নহে, কিন্তু যে পদ আনন্দময়ের অবিনশ্বর সুখরাজ্য দর্শনার্থ ধাবমান, বল দেখি এ জগতে কে তাহা কাটিতে ক্ষমবান্ আছে?"

এইরূপে নানা সৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে—ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইল। অবশেষে—উঃ বলিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে—অবশেষে নয়নযুগল উৎপাটিত। কি বীভৎস

ঘটনা! এই নৃশংস ব্যাপারে অনেক পাষাণপ্রাণ লোকও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না! চারিদিকে হা-হুতাশ পড়িয়া গেল। 'হায় হায়' উচ্চ রোলে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু তবুও করুণা কোথায়? দয়া কোথায়? মমতা কোথায়? স্নেহ-সহৃদয়তা-সমবেদনা কোথায়? এ ভীষণ পাপময় অভিনয়ক্ষেত্র হইতে যেন তাহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। পাঠক! ঐ দেখ দেখ, অশ্রু বর্ষণ কর, বুকে আঘাত কর আর দেখ, নিষ্ঠুর ঘাতক মহর্ষির পবিত্র জিহ্বা ছেদন করিতে অগ্রসর! যে পবিত্র জিহ্বায় দিবা-রজনী পবিত্র বাণী বহির্গত হইত, যে জিহ্বা কত উপদেশামৃত বর্ষণ করিত, পাষণ্ড ঘাতক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা তাহা কাটিতে উদ্যত হইল। তখন মহর্ষি প্রিয় ভাষে মৃদুস্বরে কহিলেন, "ভাই জল্লাদ! ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা কর, দুটী কথা বলিয়া লই, দয়া করিয়া দুইটী কথা বলিবার অবসর আমাকে দাও।" ঘাতক অসি সংবরণ করিল। তখন রক্তাপ্লুত মাংসপিণ্ডস্থিত মস্তক উর্দ্ধমুখে তুলিয়া কাতর-কণ্ঠে কহিলেন,—"দয়াময়! এই দুরাচরণের জন্য ইহাদের উপর কুপিত হইও না—পরমপদপ্রদানে বঞ্চিত করিও না। কেননা ইহারা যাহা করিতেছে, তাহা তোমারই জন্য—তোমারই গৌরব রক্ষার জন্য করিতেছে বিভো!"

এই সময়ে জনতার মধ্য হইতে এক লজ্জাহীনা পাপীয়সী বৃদ্ধা উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই সে মন্‌সুর, এই সেই ইস্‌লামবিরোধী ভণ্ড সাধু! মার-মার, খুব মার, যেমন কর্ম্ম, তেমনি শাস্তি দেও," ইহা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং ঋষিরাজের প্রতি একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। মহাত্মা মন্‌সুর তৎশ্রবণে জন্মের মত পবিত্র কোরাণোক্ত 'আয়েত' (শ্লোক) বিশেষ উচ্চারণের পর আর একবার উচ্চকণ্ঠে 'আনাল্ হক্' ধ্বনি করিলেন। অহো সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি দিগ্‌দিগন্তরে বিকীর্ণ হইতে না হইতে পবিত্র মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাশায়ী হইল। সাধক-শিরোমণি ধর্ম্মবীর হোসেন মন্‌সুর অবিচলিত-চিত্তে হাসিতে হাসিতে সাধুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, ঈশ্বর-প্রেমিকতার অতুলনীয় খ্যাতি রাখিয়া সর্ব্বসমক্ষে পরাৎপর প্রভুর নামে সুদুর্লভ ঋষিজীবন উৎসর্গ করি-লেন। * তাঁহার পূতাত্মা নশ্বর দেহ-বন্ধন বিমুক্ত হইয়া স্বর্গীয় সমীরণ সহযোগে অলক্ষ্যে উত্থান করত সেই নিত্যধামে যোগ্য পাত্রে যাইয়া সম্মিলিত হইল,—যে ধামে শান্তি-সুখ, প্রেম-পবিত্রতা, প্রীতি-প্রফুল্লতা, আনন্দোৎসব চিরবিরাজমান, যে রাজ্যের প্রজা সকলেই সাম্য-ভাবাপন্ন, সদাপ্রফুল্ল—পরম সুখী, যেখানে প্রেমি-

* বন্দী হওয়ার একবৎসর পরে হিজরী ৩০৬ সালে এই নৃশংস কাণ্ড ঘটে।

কের প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করে—পিপাসা চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। আর তাঁহার দেহ? অনিত্য —অসার—একত্র-সংযোজিত পরমাণুসমষ্টি দেহ? তাহা অনাদরে—অবহেলায়—বিকৃত অবস্থায় নানা নির্য্যাতন ভোগ করণার্থ ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল! কেন তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন? সে দেহের আদরে বা অনাদরে লাভালাভ কি আছে? কঞ্চুক পরিত্যাগ করিলে অহিবর সে দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না! কিসের আবশ্যক? কিন্তু পাঠক! এ সাধারণ কঞ্চুক নহে! পবিত্র আধেয় ধারণ করিয়াছিল বলিয়া এক্ষণে সেই কঞ্চুক—সেই সুপবিত্র আধার স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশে উদ্দৃপ্ত হইল।

তপস্বীর ছিন্ন শির ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইতস্ততঃ ধূলায় পতিত। নগরবাসীদের আর উদ্বেগ নাই—উত্তেজনা নাই—সমস্ত ক্ষোভ দূর হইয়াছে। কিন্তু এ আবার কি অলৌকিক ঘটনা! কি এ উদ্বেগ উপস্থিত!! সেই সমস্ত দেহাংশ ও প্রত্যেক রক্তকণিকা হইতে অবিরল 'আনাল্ হক্' শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। বিরাম নাই, মুহুর্মুহু—দমে দমে 'আনাল্ হক্' ধ্বনির উত্থান। এই ঘটনায় অনেক লোক শোকসন্তপ্ত হইল, বিপক্ষদল ক্ষোভে ও অভিমানে ম্রিয়মাণ। কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে ক্রোধান্ধ হইয়া খণ্ডিত দেহ ও ছিন্ন

মস্তক আবার সহস্রধা ক্ষুদ্র অংশে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহাতে আরও বিপরীত কাণ্ড ঘটিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, তদ্রূপ করিলে সমস্ত জঞ্জাল কাটিয়া যাইবে—রোগের উপশম হইবে। কিন্তু কি মূর্খতা! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তকণিকা হইতে যে শব্দের অবিরল উত্থান, মহর্ষির দেহ অসংখ্য অংশ বিভক্ত করিলেও কি তাহাতে নিবৃত্ত থাকিবে বলিয়া সম্ভব? ফলতঃ উপশমিত হওয়া দূরে থাক্, উত্তরোত্তর উপসর্গের বৃদ্ধিই হইতে চলিল। কি জানি কোন্ শক্তিপ্রভাবে সেই অগণিত মাংসখণ্ড হইতে সমস্বরে 'আনাল হক্' শব্দোত্থিত হইয়া দশদিক প্রতিধ্বনিত করিল; সহসা যেন প্রবল ঝটিকায় শান্ত সাগর তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। পরিণাম আরও যে কি ভয়ানক হইবে, তাহাই ভাবিয়া সকলে চমকিত, অবাক্ ও ভয়বিহ্বল। প্রধান পক্ষীয়-দের মুখ ম্লান—আতালু বিশুষ্ক হইয়া গেল। পরন্তু ঘটনার অলৌকিকত্ব ও দৈবশক্তি-প্রবণতা এত দূর দেখিয়া-শুনিয়াও কাহারও চৈতন্যোদয় হইল না—কেহ দৈব কার্য্যের প্রতিকূলতাচরণ করিতে ক্ষান্ত হইল না। হায়, এতদপেক্ষা অজ্ঞানতা ও ভ্রমান্ধতা আর কি হইতে পারে? অহো কি আক্ষেপ, তৎকালের সেই উন্মত্ত জনমণ্ডলীর হৃদয় কোন্ উপ-

করণে গঠিত? তাহাতে কি কোমলত্বের কণামাত্রও ছিল না? দয়া-স্নেহ-করুণা-মমতার ছায়াও কি তাহাতে কখন পতিত হয় নাই?. ধর্ম্মের আদেশ পালন করিতে গিয়া অবশেষে যাহা অধর্ম্ম,—নিতান্ত নিষিদ্ধ পাপকর্ম্ম, তাহাও সম্পাদিত হইতে চলিল! শরিয়তের—ইস্‌লাম ধর্ম্মানুষ্ঠানের দৃঢ়-বিশ্বাসী আচার্য্যগণের মতানুসারে প্রতিদ্বন্দ্বিদল এক স্থানে পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপাকার করিয়া কাষ্ঠাদি সজ্জিত করিল এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে লক্ লক্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া ধূ ধূ শব্দে ভয়াবহ বিভাবসু জ্বলিয়া উঠিল! তখন সেই সমুদয় মাংসখণ্ড ও শোণিত সেই সর্ব্ব-সংহারক প্রচণ্ড অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল।

অহো! মহর্ষির খণ্ডিত দেহ ভস্মাকারে পরিণত হইতে চলিল। এই বার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান—আপদের শান্তি হইবে, লোকে বুঝিল। কিন্তু সকলই নিষ্ফল—সকলই নিরর্থক; কিছুতেই কিছু হইল না,—কোন চেষ্টাই ফলবতী হইল না। ছিন্ন অবয়বসমূহ ভস্মাকারে পরিণত করিতে প্রচণ্ড হুতাশনের সাহস হইল না—মাংসরাশি কিছুতেই পুড়িল না। * অধিকন্তু

* কেহ কেহ বলেন, মহর্ষির খণ্ডিত দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল। কিন্তু এক খানি বিশ্বস্ত গ্রন্থে তাঁহার মহিমময় দেহ ভস্মীভূত হয় নাই বলিয়া বর্ণিত আছে। আমরা তাহাই বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

হিতে বিপরীত ! সেই শব্দ—সেই নিষিদ্ধ 'আনাল হক, শব্দের প্রসার বাড়িয়া গেল। সে ধ্বনি অনলরাশি ও তজ্জাত ভস্ম হইতেও ঘন, ঘন উত্থিত হইতে লাগিল। কি জ্বালা ! এত করিয়াও এ বিপদের নিরাকরণ নাই ! সকলের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, হতাশে হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাদের প্রতি কেশরন্ধ্র হইতে যেন অনলস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে সকলে ভীষণ রোষপরবশ হইয়া সেই মাংসখণ্ডসমূহ ও ভস্মাদি দেশান্তরিত করণার্থ পরামর্শ করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। উহা 'আনাল হক্' শব্দে সৈকতভূমি কাঁপাইয়া, বারিরাশি মাতাইয়া স্রোতোবেগে অকূল পাথারে ভাসিয়া চলিল।

এক্ষণে বলুন দেখি পাঠক ! এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ কি ? উত্তর—নিয়তিলিপি। নিয়তিলিপি অবিচল—অনিবার্য্য। সে লিপির লিখন খণ্ডন করিতে কাহার সাধ্য নাই। এক দিন বিধাতাপুরুষ অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন—প্রস্তরাঙ্কিতবৎ জ্বলদক্ষরে আঁকিয়া দিয়াছেন, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে—বিন্দু পরিমাণে তাহার 'নড়চড়' হইবার নহে ! সসাগরা ধরার প্রচণ্ডবিক্রম সার্ব্বভৌম নরপতি ও দীন-হীন নিরাশ্রয় পথের ভিখারী, পরমধার্ম্মিক নিত্য-জিতেন্দ্রিয় সাধুপুরুষ

ও পরস্বাপহারী সদা-কদাচারী দুর্দ্দান্ত দস্যু; অগাধ মনীষাসম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ও হিতাহিত-বোধহীন নিরক্ষর মূর্খ; দিব্যলাবণ্যপরিশোভিত বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ ও চলচ্ছক্তিবিরহিত লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ; নবযৌবনগৌরবিণী রূপবতী কামিনী ও রূপযৌবনবিগতা পলিতকেশা প্রবীণা; পবিত্রতা-সলিল-স্নাত প্রিয়দর্শন বালক ও উদগতোন্মুখী শুদ্ধমতি সুকুমারী বালিকা, সকলেই নিয়তির অধীন—সকলেই সুখে দুঃখে নিয়ত নিয়তির পূজা করিয়া থাকে। তাই পুনঃ বলিতেছি, বিশ্বসংসারে নিয়তির সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ কেহই নহেন। নিয়তি সর্ব্বোপরি প্রবল! বিশ্ববিশ্রুত মহাবীর রোস্তম বীরত্ব-মহিমায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বটে, কিন্তু নিয়তির নিকটে তাঁহাকেও মস্তক নত করিতে হইয়াছিল। বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের নামে এক দিন পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল বটে,কিন্তু তিনিও নিয়তিকে কম্পিতাঙ্গে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিয়তির অলঙ্ঘ্য প্রভাবে সকলেই আবদ্ধ—নিয়ন্ত্রিত। আজ সেই নিয়তিচক্রে নিপতিত হইয়া ঋষিরাজ মনসুরও আপনার জীবন ও গৌরব-গুরুত্ব বিসর্জ্জন করিলেন।

উপসংহার

সাগরের সীমা নাই। সাগর অসীম, অনন্ত, অতলস্পর্শ ও সুদূর প্রসারিত। সাগরের যে দিকে তাকাও, দেখিবে অনন্ত বারিরাশি হৃদয়ে ধরিয়া বিস্তীর্ণ মরুস্থলীর ন্যায় সাগর ধূ-ধূ করিতেছে। পবিত্র মাংসখণ্ডসমূহ স্রোতের আকর্ষণে এই সুদূর সাগরে আসিয়া পড়িবে ও বিলুপ্ত হইবে বলিয়া তাহা সরিৎ-সলিলে নিক্ষিপ্ত হইল! লোকে ভাবিয়াছিল, এইবার এই অলৌকিক অভিনয়ের যবনিকাপতন হইল—চিন্তার অবসান হইল। কিন্তু আবার কি এক বিস্ময়কর অভিনব কাণ্ড! ঋষিরাজের স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত দেহাংশসমূহ সরিৎ-সলিলে *নিক্ষেপ করিবামাত্র জলরাশি প্রবল তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত* হইয়া উঠিল এবং নিক্ষেপকারীদিগকে আক্রমণ করণার্থ কূলাভিমুখে ধাবিত হইল। বেলাভূমি প্লাবিত করিয়া, ভাসমান জলযানাদি বিপর্য্যস্ত করিয়া জলোচ্ছ্বাস উপ-কূলস্থ ব্যক্তিবৃন্দকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বুঝিবা নগরও ডুবিয়া যায়। কি ভীষণ দৈববিড়ম্বনা! তখন সকলেই আসন্ন বিপদে রক্ষা পাইবার জন্য পলায়নোদ্যত হইল,—যে যে-দিকে পারিল, প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল! কিন্তু স্রোতের প্রচণ্ড আঘাত

অনেককেই সহ্য করিতে হইল। কত জন নিমজ্জিত, কত জন ভূপতিত ও কর্দ্দমাক্ত হইল, কেহ কেহ বা অন্য কাহারও বস্ত্র বা হস্তাদি ধারণ করত প্রাণরক্ষায় চেষ্টিত হইল। "পলাও পলাও" ভয়ানক কোলাহল সহ জলোচ্ছ্বাসের অগ্রে মানবস্রোত বহিয়া চলিল!

এদিকে মহর্ষির জনৈক প্রিয় শিষ্য এই ভীষণ ঘটনায় শান্তি স্থাপনার্থ সত্বর তথায় উপনীত হইলেন। মহর্ষি জীবনকালে একদা এই শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,—"আমার ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলে যখন বারি-রাশি স্ফীত হইয়া লোকদিগের অনিষ্ট কামনায় প্রধাবিত হইবে, তখন তুমি আমার জীর্ণ বৈরাগ্যবস্ত্র অবিলম্বে জলোপরি নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে উচ্ছ্বসিত অম্বুরাশি অবনত ও শান্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবে এবং সম-বেত ব্যক্তিবর্গও অনিষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।" মহর্ষির এই উপদেশানুসারে তাঁহার সেই শিষ্য যথাকালে সেই পবিত্র অঙ্গাচ্ছাদনী ক্ষিপ্রহস্তে উত্তাল তরঙ্গোপরি নিক্ষেপ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! অমনি উচ্ছ্বাস-উদ্ধত জলরাশি প্রশান্তভাবে নিস্তব্ধতা অবলম্বনে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত হইল— যেন ঊর্দ্ধোত্থিত অনল-শিখায় বারিবর্ষণ হইল, ক্রোধোদ্দীপ্ত বিস্তৃতফণ অহিরাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করিল। হায়, সব ফুরাইল!

পাঠক! এক্ষণে বলুন, ইহা মহর্ষির মাহাত্ম্যের পরিচায়ক নহে কি? তাঁহার অকৃত্রিম ঈশ্বর-সাধনার জাজ্বল্যমান প্রমাণ নহে কি? লোকসাধারণে অবশেষে বিপন্মুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় ভাবিয়া মর্ম্ম বুঝিল এবং একেবারে চমৎকার-রসে অভিষিক্ত হইয়া গেল, ঘটনার অলৌকিকত্বে সকলের অন্তরে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইল। কেহ হাস্যমুখে, কেহ চিন্তাভারাবনত অন্তরে, কেহ বা প্রকাশ্য অনুশোচনার সহিত স্ব স্ব ভবনাভিমুখী হইল। বোগদাদের আবাল-বৃদ্ধবনিতার মুখে দিবারজনী এই অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

পরিশেষে সৎকার-ব্যবস্থা। নগরবাসীরা বিপক্ষ, কিন্তু তাই বলিয়া মহর্ষির শিষ্যবর্গ কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইবেন কেন? তাঁহারা মহর্ষির অন্তিম সৎকার করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং ব্যথিত অন্তরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া অস্থিমাংস সংগ্রহ পূর্ব্বক শাস্ত্রসঙ্গত বিধানানুসারে সমাধি প্রদান করিলেন। হায়! এইরূপে এক জন অসাধারণ তেজস্বী, অমানুষিক জ্ঞানগরীয়ান, অতুলনীয় তত্ত্বদর্শী, অলৌকিক কার্য্যক্ষম ও নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ তাপসের পবিত্র জীবনাভি[illegible]ের যবনিকা-[illegible] হইল।